প্রথম আলো

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি ‘অকার্যকর’ প্রমাণিত হচ্ছে

ভারত

পররাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২০২৫ সাল ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য সবচেয়ে কঠিন বছর। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ‘অকার্যকর’ প্রমাণিত হচ্ছে কি না, তা নিয়ে লিখেছেন **চিতিজ বাজপেয়ী**

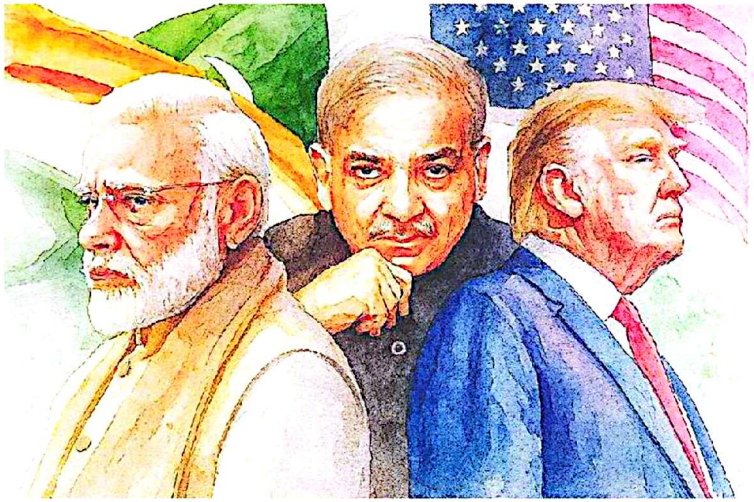

- শীতল যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কৌশলগত বাধ্যবাধকতা ভারতকে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করে।
- ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ‘স্বাভাবিক মিত্র’ হিসেবে ভারতের ধারণাগত নিশ্চয়তাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।
- দুনিয়ার বন্ধু হওয়া এবং দুনিয়াকে পরস্পরের বন্ধু বানাতে সাহায্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ভারত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনটি প্রধান বৈশ্বিক শক্তি রাশিয়া, চীন এবং সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের আতিথ্য দিচ্ছে। বিষয়টি দেশটির দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিকে সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরে।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ডিসেম্বরে ভারতে সফর করার কথা রয়েছে, যা হবে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর তাঁর প্রথম ভারত সফর। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং আগামী বছর ভারতে আসতে পারেন, যখন দেশটি ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক হবে। কোয়াড নিরাপত্তা সংলাপের এ বছরের সম্মেলনটি এ মাসে ভারতে হওয়ার কথা থাকলেও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অবনতির কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে। বৈঠকটি যদি আগামী বছরে পুনর্নির্ধারিত হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ভারতে সফর করতে পারেন।

তবে এই বয়ানের একটি উল্টো দিকও আছে। ভারতের সমদূরত্ব বজায় রাখা পররাষ্ট্রনীতি অনেক সময় দূরত্বপূর্ণ বা উদাসীন হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ট্রাম্প ভারতকে শাস্তি দিতে বাণিজ্য বৈষম্য এবং রুশ অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন।

এদিকে যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও বড় বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় রাখে বা রুশ অপরিশোধিত তেলের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল, সেসব দেশকে একই মাত্রায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় গুরুত্ব (যেমন চীন) অথবা যুক্তরাষ্ট্রের জোটভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থানের (যেমন জাপান, তুরস্ক) কারণে সেটা করা হয়নি।

ভিন্নতর আচরণটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ভারতের কৌশলগত অপরিহার্যতার অভাবই প্রতিফলিত হয়। ভারতের জন্য একটি মূল শিক্ষা হলো—নিষ্ক্রিয় নয় বরং আরও সক্রিয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলা।

২.

২০২৫ সাল সম্ভবত ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য সবচেয়ে কঠিন পররাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত বছর। এপ্রিল মাসে ভারতশাসিত কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পর মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চার দিনের সংঘাত ঘটে। সংক্ষিপ্ত হলেও এই সংঘাত ছিল দশকের মধ্যে দুই দেশের সবচেয়ে শত্রুতাপূর্ণ সময়।

ভারত-পাকিস্তান এ সংঘাত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতিরও উদ্দীপক হয়ে ওঠে। কারণ, ট্রাম্প দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার এ শত্রুতা অবসানের কৃতিত্ব দাবি করেন, যা নয়াদিল্লি খণ্ডন করলেও ইসলামাবাদ তা সানন্দে প্রতিধ্বনিত করে। অপমানের ওপর অপমান যোগ করে, সংঘর্ষের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়, যেখানে হোয়াইট হাউস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আসিম মুনিরকে দুবার আমন্ত্রণ জানায়।

জুন মাসে মোদি ও ট্রাম্প ফোনালাপ করেন, যেখানে ট্রাম্প মোদি ও মুনিরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব দেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। মোদি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা এবং বিশেষত কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের অনীহা রয়েছে। এরপর দুই নেতা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর কথা বলেননি, যা সম্পর্কের শীতলতার ইঙ্গিত দেয়।

এ সময়ের মধ্যে দুই দেশ দ্রুত অবনতিশীল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রবেশ করে। কারণ, আগস্টে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তারা কোনো বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেনি এবং এরপর ভারত ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বোচ্চ শুল্কের ‘শিকার’ হয়। ‘মৃত’ অর্থনীতি হিসেবে ভারতকে ট্রাম্পের অবমাননা করা এবং তাঁর বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোর ‘ক্রেমলিনের লন্ড্রি’ বলে ভারতকে অভিহিত করা—দ্বিপক্ষীয় আস্থাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দুই নেতার সাম্প্রতিক আপসসূচক বক্তব্য উত্তেজনা প্রশমনের এবং শেষ পর্যন্ত একটি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে নয়াদিল্লির আগের অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস, যেমন ভারতীয়দের মধ্যে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে অধিক ইতিবাচক মনোভাব ম্লান হয়েছে।

একইভাবে ম্লান হয়েছে মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে বিশেষ বা সুবিধাপ্রাপ্ত সম্পর্ক থাকার দাবি। মোদি তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে গর্ব করতেন, যেখানে তিনি বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তবে এটি ট্রাম্পের খামখেয়ালি ও লেনদেনভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতির ক্রোধ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি।

আরও মৌলিকভাবে বললে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সামনে থাকা বিস্তৃত চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে। ভারতের দীর্ঘদিনের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমনি এক বোঝা। একদিকে এটি ভারতকে নমনীয়তা দেয়। এটি স্পষ্ট হয় যখন ২০২০ সালে সীমান্ত সংঘর্ষের পর চীন-ভারত সম্পর্কে অবনতি ঘটে। নয়াদিল্লি এর জবাবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা গভীর করে, যার প্রমাণ কোয়াডে ভারতের সম্পৃক্ততা এবং যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে তার গভীরতর সংযুক্তি।

এই বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় পররাষ্ট্রনীতি ভারতের জন্য সুবিধা এনে দিচ্ছে। কারণ, এটি কোনো এক দেশের প্রতি বাধ্য নয়। ২০২৪ সালে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মন্তব্য করেন, ভারতকে প্রশংসা করা উচিত তার পররাষ্ট্রনীতিতে ‘বহুবিধ বিকল্প’ বজায় রাখার জন্য।

তবে গত বছরের ঘটনাবলি এই অবস্থানের ঔদ্ধত্যকে তুলে ধরে, যখন ভারতকে প্রধান শক্তিগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করা হয়; তখন কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ধরে রাখা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। এটাই ঘটে যখন ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ করে; ইউক্রেনে শান্তিচুক্তি করতে মস্কোর ওপর চাপ প্রয়োগের একটি উপায় হিসেবে। রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লির সঙ্গে মস্কোর সম্পর্কও ওয়াশিংটনের অধিকতর নজরদারিতে আসে।

৩.

কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের শিকড় শীতল যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষতার ধারণায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বৈশ্বিক সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার পর ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে কোনো জোটে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে তোলে, যা দেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারত। মূলত নিরপেক্ষতা ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সব প্রধান প্রভাবকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নমনীয়তা ধরে রাখা।

নিরপেক্ষতা সব সময় বাস্তবে কার্যকর হয়নি। শীতল যুদ্ধকালে অস্তিত্বগত হুমকির মুখে পড়লে ভারতের কৌশলগত নমনীয়তা ক্ষয়ে যায় এবং দেশটি সমর্থনের জন্য দুই পরাশক্তির একটির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। এটি স্পষ্ট হয় ১৯৬২ সালে, যখন চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় নয়াদিল্লি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমর্থনে ঝুঁকে পড়ে।

আবার ১৯৭১ সালে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। সে সময় পাকিস্তান চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

শীতল যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কৌশলগত বাধ্যবাধকতা ভারতকে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ও পণ্য বিনিময় চুক্তি হারানোর ফলে নয়াদিল্লি উপলব্ধি করে যে তাকে তার বৈদেশিক সম্পর্ক নতুনভাবে সাজাতে হবে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তবে সর্বমুখী বা বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি অপরিবর্তিত থাকে।

৪.

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক সম্পর্কের অবনতি দেখায় যে ভারতের আরও সক্রিয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্প্রতিক জি-২০ সম্মেলনে মোদির অংশগ্রহণ এবং অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন অংশীদারির চুক্তি নয়াদিল্লির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে যে দেশটি বৈশ্বিক দক্ষিণের কণ্ঠস্বর হতে চায়, পশ্চিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে চায় এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চায়।

মোদি সরকার ভারতকে ‘বিশ্বমিত্র’ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু দুনিয়ার বন্ধু হওয়া এবং দুনিয়াকে পরস্পরের বন্ধু বানাতে সাহায্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইরান ও ইসরায়েল—উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা সত্ত্বেও ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাতে উত্তেজনা প্রশমনে নয়াদিল্লির ভূমিকা সীমিত ছিল (কাতার, তুরস্ক, ব্রাজিল, এমনকি চীনের মতো দেশগুলোর ভূমিকার বিপরীতে)।

ভারত যদি এমন ভূমিকা পালন করত, তবে তা সেই গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, যা দেশটি একসময় পালন করেছিল; তখন ভারত ছিল আরও দুর্বল শক্তি। ১৯৫০-এর দশকে কোরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে তাইওয়ান প্রণালি সংকট পর্যন্ত বহু বৈশ্বিক সংঘাতে ভারত ছিল একটি প্রধান কণ্ঠ।

এসবের পরিবর্তে ভারত দূরত্ব বজায় রাখার পথ বেছে নিয়েছে। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অক্টোবর মাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মোদির অনুপস্থিতি। প্রথমটি শারম আল-শেখে গাজা শান্তি সম্মেলন এবং দ্বিতীয়টি কুয়ালালামপুরে পূর্ব এশিয়া সম্মেলন। উভয় ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণ পেলেও মোদি অংশ নেননি।

যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো—উভয় বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় (মধ্যপ্রাচ্য), যাকে ভারত তার ‘বিস্তৃত প্রতিবেশ’ বলে। এতে বিশ্বমঞ্চে নয়াদিল্লির উদাসীনতা ফুটে ওঠে।

ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান আরও সক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় একটি শিক্ষা দেয়। ইসলামাবাদ তার নিজস্ব ধরনের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অনুশীলন করছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইরান এবং উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করে।

যেখানে নয়াদিল্লি ভূরাজনৈতিক উত্তপ্ত অঞ্চলগুলো থেকে দূরে থাকতে চায়, সেখানে ইসলামাবাদ আগ্রহভরে এগিয়ে আসে; ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হওয়া, ২০০০-এর দশকে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে অংশ নেওয়া এবং সম্প্রতি সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা স্থাপত্যকে সমর্থন করা পর্যন্ত।

পাকিস্তান এটি ধরে রাখতে পারবে কি না, তা আরেক প্রশ্ন, যদি বিবেচনা করা হয় তাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলোকে; যেমন—চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই বন্দর প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া। অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তবর্তী অস্থিরতাগুলো বিবেচনায় নিলে ইসলামাবাদ কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে বিস্তৃত প্রতিরোধ ক্ষমতা দেওয়ার আশা করে? তবু এটি দেখায় কীভাবে নয়াদিল্লির তুলনায় আরও সক্রিয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অনুশীলন করা যেতে পারে।

একটি ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার বিশ্বে ভারতকে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অর্থ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। এ বছরের ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ‘স্বাভাবিক মিত্র’ হিসেবে ভারতের ধারণাগত নিশ্চয়তাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভারতের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ বাড়ছে, যার থেকে দেশটি এত দিন বিরত থেকেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাছে নিজেকে কৌশলগতভাবে আরও অপরিহার্য করে তোলা ট্রাম্প অথবা অন্য যেকোনো দেশের খামখেয়ালিপনা নেতার থেকে ভারতের ঝুঁকি কমাবে।

গ্লোবাল ফোরামগুলোতে ট্রাম্প প্রশাসনের অনুপস্থিতি এবং কখনো কখনো অস্থিতিশীল ভূমিকা বৈশ্বিক নেতৃত্বে একধরনের শূন্যতা তৈরি করেছে। ভারতের এগিয়ে আসার এর চেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত আর হতে পারে না।

● **চিতিজ বাজপেয়ী** চ্যাথাম হাউসের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো

ফরেন পলিসি থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মনজুরুল ইসলাম

CamScanner

প্রথম আলো

মূল্যস্ফীতি কমবে কীভাবে

মামুন রশীদ

শ্রীলঙ্কা কিংবা তুরস্কে মূল্যস্ফীতি ৫০-৬০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছিল, কিন্তু সেখানে কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর রাজস্ব ও ব্যয় সংকোচন এবং সুসংহত জন-অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ফলে আবার তা কমতেও শুরু করেছে। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার অপ্রতিরোধ্য সংকট থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ভারতের নামও আলোচনায় আসে। ভারত তাদের খুচরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অভূতপূর্ব সফলতা দেখিয়েছে। *ইকোনমিক টাইমস*-এর তথ্যমতে, অক্টোবর মাসে ভারতের খুচরা মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশে, অর্থাৎ ১ শতাংশের নিচে। এটি তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশের চেয়েও অনেক কম। লাগাতার সাত মাস মূল্যস্ফীতি আরবিআইয়ের সহনসীমার নিচে থাকায় এবং বাজারের পূর্বাভাসের (শূন্য দশমিক ৪৮ শতাংশ) অনেক নিচে নেমে আসায় এটিকে ঐতিহাসিক সাফল্য বলা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যপতন, শুল্কছাড় এবং কিছু নিত্যপণ্যে কর হ্রাস—এই সব মিলিয়ে ভারতের ঘরোয়া চাহিদা এখন আরও শক্তিশালী হওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফলে আরবিআই আগামী মাসেই নীতি সুদ কমাতে পারে, এমন প্রত্যাশাও করা হচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনো ৮ শতাংশের ঘরেই আটকে আছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে এটি সামান্য কমে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ হলেও সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। বিশ্লেষকদের মতে, ১০ শতাংশের ঘর থেকে নেমে এলেও ৮ শতাংশের মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য স্বস্তি আনতে পারছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো দামই বাস্তবে আগের অবস্থায় ফিরছে না। বরং বাজারে একধরনের নতুন 'স্বাভাবিকতা' তৈরি হয়ে গেছে—উচ্চ দামের মধ্যেই মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার বাড়িয়ে ১০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। কিন্তু সুদ বাড়ালেই মূল্যস্ফীতি কমবে—এ তত্ত্ব অন্তত আমাদের বাস্তবতায় কার্যকর হয়নি। কারণ, আমাদের মূল্যস্ফীতির মূল উৎস চাহিদাজনিত নয়, বরং সরবরাহ ঘাটতি, আমদানি ব্যয়, বিনিময় হারে অস্থিতিশীলতা, বাজার সিন্ডিকেট এবং দুর্বল বাজার তদারকি। ফলে সুদ বাড়ালে ঋণের প্রবাহ কমে যায়, বিনিয়োগ শ্লথ হয়, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়; কিন্তু মূল্যস্ফীতির মূল সমস্যায় তেমন আঘাত লাগে না।

এখন প্রশ্ন—মূল্যস্ফীতি কমাতে আসলে কী করতে হবে? বহুদিন ধরে বলা হচ্ছে, মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বিত রাজস্বনীতি প্রয়োজন। অতিরিক্ত কর ও শুল্কভার কমিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো, অযৌক্তিক মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক

> **সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমানোর অস্ত্র বাংলাদেশে অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। আমাদের মূল্যস্ফীতির কারণ 'হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' তাই প্রকৃত সমাধানও অন্য কোথাও খুঁজতে হবে**

পরিকল্পনা—এসব না করলে মুদ্রানীতি একা কিছুই করতে পারবে না। বাজার ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি এবং সঠিক চাহিদা-উৎপাদন তথ্যের অভাব আজও দূর হয়নি। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও বলা যায় না পরিসংখ্যানের প্রতি জনসাধারণের আস্থাহীনতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে।

আরও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় অনেকে সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছেন, এমনকি জমিজমা বিক্রি করতেও বাধ্য হচ্ছেন। গ্রাম-শহর উভয় জায়গাতেই আয়বৈষম্য আরও চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। শহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্বলতার সরাসরি সূচক। অন্যদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ায় দুর্নীতিও কমেনি। বরং অনেকে বলছেন, পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এটি আরও বেড়ে গেছে।

আগেও বলেছি, সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমানোর অস্ত্র বাংলাদেশে অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। আমাদের মূল্যস্ফীতির কারণ 'হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' তাই প্রকৃত সমাধানও অন্য কোথাও খুঁজতে হবে।

মোদ্দাকথা, উৎপাদন বাড়াতে হবে, বিশেষ করে খাদ্য ও শিল্পপণ্য। সরবরাহ শৃঙ্খল উন্নত করতে হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের আধিপত্য কমে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান বহুমুখী করতে হবে, আমদানি-রপ্তানি নীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠী মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় ভেঙে না পড়ে। আর প্রয়োজনে বাজারে অরাজকতা সৃষ্টি করা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও জরুরি হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি কোনো স্বাভাবিকতা নয়, বরং দীর্ঘদিনের গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এটাকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের সাহসী নীতিগত সিদ্ধান্ত, স্বচ্ছ পরিসংখ্যান এবং আজ না হলে কাল আমাদের শক্তিশালী বাজার সুশাসনের দিকে এগোতেই হবে।

● **মামুন রশীদ** অর্থনীতি বিশ্লেষক

CamScanner

প্রথম আলো

নিষেধাজ্ঞা

রাশিয়াকে ইউক্রেনে তার যুদ্ধের মূল্য দিতে হবে

জোসেফ ই স্টিগলিৎস ও অ্যান্ড্রু কোসেনকো

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের চতুর্থ বর্ষপূর্তি ঘনিয়ে আসছে; কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এখনো সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়নি, যা ইউক্রেনের পরিস্থিতিতে বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারত। সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হলো রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ ব্যবহার করে ইউক্রেনকে সাহায্য করা। এই সম্পদ ব্যবহার করা গেলে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ অনেকটাই সুরক্ষিত হবে। একই সঙ্গে ইউরোপের ভবিষ্যৎও নিরাপদ হবে।

এ সপ্তাহে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ জানান, ইউক্রেনের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়টি ইইউ দেশগুলো কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত করবে।

রাশিয়া ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেনের বাড়িঘর, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণব্যবস্থা, ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ—সবই হামলার শিকার হচ্ছে। তাই আর্থিক সহায়তা তাদের এখন খুবই দরকার। যুদ্ধ যদি ২০২৬ সালে শেষ হয়ও এবং পুনর্গঠনের বিশাল খরচ (যা ৫০০ বিলিয়ন ডলারের অনেক বেশি) বাদও দেওয়া হয়। এরপরও অন্যান্য সহায়তার বাইরে শুধু যুদ্ধের কারণে অর্থনীতির ক্ষতির জন্য ইউক্রেনের আগামী দুই বছরে প্রায় ১৪০ বিলিয়ন ডলার লাগবে।

ইউক্রেন এখনো সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করছে। অসীম শক্তিধর আক্রমণকারীকে তারা প্রায় স্থবির করে রেখেছে। রাশিয়ার হতাহতের সংখ্যা (মৃত ও আহত মিলিয়ে) ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। এত মানুষের প্রাণহানির পরও রাশিয়া খুব সামান্যই লাভ করেছে। যুদ্ধ শুরুর সময় যে কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর কথা রাশিয়া জানিয়েছিল, তার কোনোটিই তারা পূরণ করতে পারেনি।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আক্রমণের পরপরই পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৩০০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ আটকে দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে জি-৭ দেশগুলো একটি 'এক্সট্রা-অর্ডিনারি রেভিনিউ অ্যাকসেলারেশন' (ইআরএ) কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জব্দ করা রুশ সম্পদ থেকে পাওয়া সুদ দিয়ে ইউক্রেনকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

এই ঋণ ইউক্রেনকে ফেরত দিতে হবে না, যতক্ষণ না রাশিয়া ইউক্রেনকে সব ক্ষতিপূরণ দেয়। আর মূল পার্থক্য হলো ইউরোক্লিয়ার আগের মতো ইসিবির অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না রেখে এখন সেই অর্থ কমিশনের সবচেয়ে নিরাপদ (এএএ রেটেড) বন্ডে বিনিয়োগ করবে। রাশিয়া চাইলে ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর আবার এই সম্পদের মালিকানা ফিরে পেতে পারে। অর্থাৎ ঋণটি অস্থায়ী ও ফেরতযোগ্য।

আমরা আগেও বলেছি, এটিকে 'সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা' বলে কেউ দেখবে না। যারা বলেছিল সম্পদ আটকে রাখলে বা ইআরএ কর্মসূচি চালু হলে নানা ক্ষতি হবে—তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটিও সত্য হয়নি। ইউরো এখনো ডলারের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। আর ইউরোপের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে নিরাপদ স্থান।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

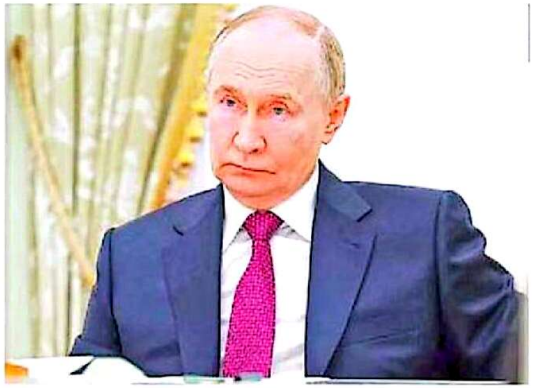

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম ভেঙে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা-সংকট তৈরি করেছে; কিন্তু তবু তার সম্পদ ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের আইনি সুরক্ষা পাচ্ছে। আদতে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর সময় এখনই। তেল-গ্যাস থেকে আয় কমে যাওয়ায় রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধ চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে তার প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছে, আর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি রুশ জনগণকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞার ফলে সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ভারত রুশ তেলের আমদানি বন্ধ করেছে। চীনের চারটি বড় রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানিও সাময়িকভাবে রুশ তেল না কেনার ইঙ্গিত দিয়েছে। রাশিয়ার তেলের ৮৫ শতাংশ বিক্রি হয় ভারত ও চীনে। এই বাজার হারালে রাশিয়ার যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতার ওপর বড় চাপ পড়বে। তাই রাশিয়া এখন দ্রুতই অনুকূল শর্তে যুদ্ধের ইতি টানতে চাইছে।

ক্ষতিপূরণ ঋণের সম্ভাব্য ঝুঁকি ভাগাভাগি করার জন্য বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট দে ওয়েভার চাইছেন, ইইউর অন্যান্য দেশ গ্যারান্টি দিক যেন রাশিয়ার পক্ষে কোনো মামলা জিতে গেলে বেলজিয়ামকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। তাই প্রতিটি দেশ তাদের মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে ঋণের একটি অংশের গ্যারান্টি দেবে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর উচিত রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তিগুলো বাতিল করা। এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। রাশিয়া তো ইতিমধ্যে অনেক ইউরোপীয় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। ইউরোপের বহু নেতা স্বীকার করেন, ইউরোপকে (যুক্তরাজ্য ও নরওয়েসহ) নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হবে। ইউক্রেনকে ক্ষতিপূরণ ঋণ দেওয়া সেই দিকেই একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ, যা আমেরিকার অংশগ্রহণ ছাড়াই ইউরোপ করতে পারে। এই পথ অনুসরণ না করা নৈতিকভাবে ভুল হবে। ইউক্রেনে যে হত্যাযজ্ঞ রাশিয়া চালিয়েছে, তার দায় রাশিয়ার।

● **জোসেফ ই স্টিগলিৎস** নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও **অ্যান্ড্রু কোসেনকো** মারিস্ট কলেজের স্কুল অব ম্যানেজমেন্টে অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক।

স্বত্ব: **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

CamScanner

খেলাপি ঋণ ও সুদহার নিয়ে উদ্বেগ

সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা বলেন, দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে তাঁদের নীতিসহায়তা দিতে হবে। কমাতে হবে সুদহার ও খেলাপি ঋণ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে বাড়তে থাকা খেলাপি ঋণ ও ব্যাংকের চড়া সুদহার নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন দেশের বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, সব ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার এত চড়া সুদে ঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও করা যাচ্ছে না। এদিকে সরকারের উন্নয়নকাজ কমে যাওয়ায় ব্যবসা ও বিনিয়োগে এখন মন্দাভাব চলছে। বিনিয়োগ বাড়াতে হলে ব্যবসায়ীদের নীতিসহায়তা দিতে হবে। কমাতে হবে ঋণের সুদহার। পাশাপাশি উচ্চ খেলাপিও কমাতে হবে।

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল শনিবার *বণিক বার্তা* আয়োজিত 'চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন-২০২৫'-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে এসব কথা জানান ব্যবসায়ীরা। 'অর্থনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার' শিরোনামে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ব্যবসায়ীদের এসব উদ্বেগের কথা শুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানান, মূল্যস্ফীতির হার কমলে সুদহার কমিয়ে আনা হবে। আর খেলাপি ঋণের সংকট পুরোপুরি কাটতে ৫ থেকে ১০ বছর লাগতে পারে।

'৩৫% টাকা গেল কোথায়'

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুসারে, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ বেড়ে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা হয়েছে, যা মোট ঋণের ৩৫ শতাংশের বেশি। এই তথ্য তুলে ধরে হা-মীম গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ বলেন, এই ৩৫ শতাংশ টাকা গেল কোথায়? এই টাকা বাইরে থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ হবে না। ঋণখেলাপিদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আহসান এইচ মনসুর বলেন, প্রতি প্রান্তিকে যখন নতুন তথ্য পাই ও খেলাপি ঋণের নতুন নিয়ম কার্যকর হয়, তখন দেখা যায় খেলাপি ঋণ বাড়ছে। দুই বছর আগে সরকার বলেছিল খেলাপি ঋণের হার ৮ শতাংশ। তা এখন ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। গভর্নর আরও বলেন, 'এই খেলাপি ঋণ আমরা সৃষ্টি করিনি। একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র উন্মুক্ত করা হচ্ছে।'

অর্থনীতির চিত্র উদ্বেগজনক

বর্তমানে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির যে চিত্র উঠে এসেছে, তা উদ্বেগজনক বলে জানান এ কে আজাদ। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সূচকে আমরা ক্রমেই নিচের দিকে নামছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতির কারণে সুদের হার বেড়ে গেছে। এটি বিনিয়োগে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বর্তমান অবস্থায় শিল্পায়ন পুরোপুরি স্থবির বলা যায়।'

চড়া সুদহারের কারণে সংকটে আছেন বলে জানান জিপিএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমও। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিযোগী অন্য কোনো দেশে ১০ শতাংশ নীতি সুদহার নেই। অন্যদিকে গত দুই বছরে মেগা প্রকল্প নেই। কমেছে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজও। এতে ইস্পাত ও সিমেন্টের মতো শিল্প খাত গভীর সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।' এমন পরিস্থিতির কথা জানিয়ে গভর্নরের কাছে সুদহার কমানোর অনুরোধ জানান তিনি।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের সুদহার অবশ্যই বেশি। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে নীতি সুদহারের সঙ্গে মূল্যস্ফীতির হারের অন্তত আড়াই-তিন শতাংশ পার্থক্য থাকে। আমাদের মূল্যস্ফীতির হার এখনো ৮ দশমিক ২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি এর নিচে নামলে সুদহার কমিয়ে আনা হবে।

চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ অতিথিরা। 'অর্থনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার' শীর্ষক এ সম্মেলনের আয়োজন করে দৈনিক *বণিক বার্তা*। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে। ছবি: প্রথম আলো

ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করুন

সম্মেলনে মুক্ত আলোচনায় মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, 'আমাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করে দিন। সব ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র বিশালভাবে জেঁকে বসেছে। আমি ১০ বছর চেষ্টা করেও নারায়ণগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য একটি সেতু ও ছোট সড়ক নির্মাণ করাতে পারিনি। বিভিন্ন দপ্তরে ফাইল ওঠে আর নামে, শুধু সাপলুডু খেলা হয়।'

ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান বলেন, অর্থনীতিতে এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মূল্যস্ফীতিসহ নানা কারণে নিঃসন্দেহে অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। তবে দুই বছর আগেও টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে।

'জমিদারি কায়দায়' চলে করব্যবস্থা

বিআইডিএসের মহাপরিচালক এ কে এনামুল হক বলেন, দেশের করব্যবস্থা আজও 'জমিদারি ব্যবস্থার' মতো আচরণ করে। ব্রিটিশ শাসনে জমিদারের কাজ ছিল কর আদায় করা। দেশের উন্নতির দায়িত্ব তাদের ছিল না। আজকের কর সংগ্রহেও একই মানসিকতা দেখা যায়—যেন দেশের উন্নতি নয়, শুধু কর আদায়ই মূল লক্ষ্য।

সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের ব্যাংকগুলোতে এখন সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। আগে বোর্ডরুমে বসে ঋণ বিক্রি করা হতো। এখন নিয়ম অনুসারে অনুমোদন হচ্ছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কম আছে জানিয়ে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা সংগত কারণেই হয়তো সময় নিচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচনের পরে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আমি আশাবাদী। সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল প্রমুখ।

লুটপাটকারীদের ধরেন, কারখানা বন্ধ কেন

সম্মেলনে বললেন মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাভাবনাটা পরিবর্তন করা দরকার...। গত ১৫ বছর যাঁরা লুট করেছেন, চুরি করেছেন, ব্যাংক ডাকাতি করেছেন, তাঁদের ধরেন, তাঁদের শাস্তি দেন। তাঁদের যে শিল্পকারখানা আছে, সেগুলোতে হাজার হাজার মানুষ কাজ করছেন। সেগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় ১৪ লাখ মানুষ বেকার হয়ে গেছেন। এই লোকগুলো যাবেন কোথায়?'

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রশ্ন তোলেন, 'এই কারখানাগুলো আমরা কীভাবে চালু করতে পারি, প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কীভাবে এই মানুষগুলোর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি—তা দেখা দরকার।'

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল শনিবার চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলনে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল। এই সম্মেলনের আয়োজন করে দৈনিক *বণিক বার্তা*।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে কর্মসংস্থান। ফলে আমাদের পুরো মনোযোগ থাকছে বিনিয়োগের ওপর। আগামী দিনে ক্ষমতায় গেলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির।'

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

সম্মেলনের পৃথক অধিবেশনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেন, দুর্নীতির কারণে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। চাঁদা ও দুর্নীতি ব্যবসায়ীদের এমনভাবে অনুৎসাহিত করছে যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নতুন উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, 'নির্বাচনটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। টাকা দিয়ে কেনা যায়, এমন একটা গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, আওয়ামী লীগ চলে গেছে, সেই শূন্যস্থান কেউ না কেউ পূরণ করবে এবং পূরণ হচ্ছে। ফলে নতুন চাঁদাবাজি দৃশ্যমান।

দেশে সামাজিক ফ্যাসিবাদের নানা আলামত দেখা যাচ্ছে জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, এতে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে না।

CamScanner

ডিজিটাল ও নগদ লেনদেনের চিত্র (%)

সময়	ডিজিটাল লেনদেন		নগদ লেনদেন	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
জানুয়ারি '২৪	৫২	৩০	৪৮	৬৫
জুন '২৪	৫৪	২৫	৪৬	৭১
ডিসেম্বর '২৪	৪৫	২৭	৫২	৭০

ব্যাংক লেনদেনে নোটের ব্যবহার (%)

গ্রাফিক : সুবীর ঘোষ

ডিজিটাল লেনদেনে বিপ্লব

ক্যাশলেসে বিনিয়োগ ১২ লাখ কোটি টাকা

যুগান্তর প্রতিবেদন

নগদ অর্থবিহীন লেনদেন বা ক্যাশলেস লেনদেন বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন, ডিজিটাল সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার স্থাপন করছে। এ খাতে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর আওতায় এখন শহর থেকে উপজেলা ও কোনো কোনো ইউনিয়ন বা প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগ প্রসারিত করা হয়েছে। এ সুযোগ আরও বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গ্রাহকদেরকেও ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নগদ অর্থের লেনদেন কমানো হচ্ছে। কারণ নগদ অর্থের লেনদেনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। এতে দুর্নীতি যেমন হচ্ছে, তেমনি প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। পাশাপাশি জাল নোটের বিস্তার ঘটছে। ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু হলে এসব প্রবণতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি নগদ অর্থ ছাপানো ও ব্যবস্থাপনা বাবদ সাশ্রয় হবে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগে বড় অঙ্কের লেনদেনকে ডিজিটাল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে সফলতা আসায় এখন ছোট অঙ্কের লেনদেনও ডিজিটাল করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ৩৬ কোটি ৬৭ লাখ থেকে বেড়ে ৪০ কোটি ৩১ লাখে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে টাকার অঙ্কে লেনদেন ৭৫ হাজার ১৪০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭৬ হাজার ৩৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে নগদ লেনদেনও বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে নগদ লেনদেন ৩৪ কোটি ৬২ লাখ থেকে বেড়ে ৪৫ কোটি ৪৯ লাখে উন্নীত হয়েছে।

> “আগে ব্যবসায়ীদের পাইকারি পণ্য বেচাকেনার টাকা, আত্মীয়স্বজনের কাছে টাকা স্থানান্তর করা হতো নগদ আকারে। এখন এগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতেই করা সম্ভব হচ্ছে”

আগে যেখানে লেনদেনের প্রায় ৯০ শতাংশই নগদ অর্থের বিনিময়ে হতো। এখন সেখানে মোট লেনদেনের ৪৫ শতাংশ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা ক্যাশলেসভাবে হচ্ছে। এসব লেনদেন সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করেছে। প্রায় ১০ হাজার ৪২২ ধরনের যন্ত্রপাতি বা অবকাঠামোগত উপকরণ স্থাপন করেছে। এ খাতে বিনিয়োগ প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে এখন গ্রাহকরা এটিএম সেবার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও টাকা তুলতে পারছেন। পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে টাকা স্থানান্তর করতে পারছেন।

আগে ব্যবসায়ীদের পাইকারি পণ্য বেচাকেনার টাকা, আত্মীয়স্বজনের কাছে টাকা স্থানান্তর করা হতো নগদ আকারে। এখন এগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতেই করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে নগদ টাকার ব্যবহার কমেছে। বেড়েছে প্লাস্টিক মানি বা ই-মানির ব্যবহার। এতে টাকার ব্যবস্থাপনার খরচও কমেছে। নগদ টাকা ছাপানো, পরিবহণ ও ব্যবস্থাপনায় বছরে খরচ হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। নগদ টাকার পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু হলে এসব টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি নানা ধরনের জাল-জালিয়াতির ঘটনাও হ্রাস পাবে।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ব্যাংক খাতে লেনদেন বাড়ার একটি বড় অংশই হচ্ছে নগদ আকারে। নগদ লেনদেনকে ডিজিটালে রূপান্তর করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি গ্রাহকদেরকেও সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় লেনদেনের খাতগুলোতে ডিজিটাল লেনদেন করার সুযোগ আরও বাড়াতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ধরনের কেনাকাটার মূল্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নিয়েছে। মোট লেনদেনের মধ্যে এখনো এগিয়ে রয়েছে এটিএম সার্ভিস। মোট লেনদেনের ৫৩ শতাংশ হচ্ছে এটিএম বুথের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে লেনদেন হচ্ছে ৩৪ শতাংশ। এছাড়া কিউআর কোড ও পয়েন্ট অব সেলের মাধ্যমেও লেনদেন বাড়ছে।

বিশেষ করে ছোট লেনদেনগুলো এখনো নগদ আকারে হচ্ছে। যে কারণে ডিজিটাল লেনদেনের হার কমছে। গত বছরের জানুয়ারিতে ডিজিটাল লেনদেনের হার ছিল ৫২ শতাংশ এবং নগদ লেনদেন ছিল ৪৮ শতাংশ। ডিসেম্বরে ডিজিটাল লেনদেন কমে ৪৫ শতাংশ ও নগদ লেনদেন বেড়ে ৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে মূল্যমানের দিক থেকে ডিজিটাল লেনদেনে ২৭ শতাংশ এবং নগদ লেনদেন ৭০ শতাংশ ও বাকি লেনদেন অন্যভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ○ এরপর ৮ পাতায়

CamScanner

সামাজিক উদ্যোগ ও উদ্ভাবন তুলে ধরলেন তরুণ উদ্যোক্তারা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভারে 'কার্নিভাল অব চেঞ্জ' শুরু

দেশকে এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা, তাদের উদ্ভাবন আর নানা উদ্যোগের প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী 'কার্নিভাল অব চেঞ্জ-২০২৫'। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ২৫০ জনেরও বেশি তরুণ-তরুণী অংশ নেন।

গতকাল শনিবার সাভারে ব্র্যাক সিডিএমএ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের সামাজিক উদ্যোগ ও উদ্ভাবন প্রদর্শনের পাশাপাশি মতবিনিময়, আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বক্তব্য দেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ ।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, মানুষের আনন্দকে বাধা দিতে নেই। আমাদের অভিভাবকরা সব সময় আনন্দকে বাধা দিতে চান। সন্তান পড়তে চায় সাহিত্য, পরিবারের চাপে পড়ে অ্যাকাউন্টিং। যার অন্তরে যা চায়, তাই করুক। সেখানেই সে সেরা হবে। জোর করে কাউকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে– আত্মা কী চায়; জীবন কী চায়। তোমার স্বপ্ন কী বলে সেটাকে তাড়া করতে হবে। তিনি বলেন, জীবনে কোনো কিছু ছাড়তে হয় না, কিন্তু পরিবর্তন করতে হয়। এর মাধ্যমেই আসবে সফলতা। কাজের প্রতি পাগল না হলে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। তবে পুরস্কার পাগল হলে হবে না, কাজী নজরুল ইসলামের মতো উন্মাদ হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তরুণদের উদ্দেশে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্ বলেন, চিন্তা করতে ও বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে হবে। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদও সমাজের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ছোট পরিসরে কাজ শুরু করেছিলেন। সেই ব্র্যাক এখন বৃহৎ সোশ্যাল ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে।

বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ দেশে সমস্যার শেষ নেই উল্লেখ করে আসিফ সালেহ্ বলেন, এসব সমস্যা সমাধানে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের জীবনে বদল আনে– এমন কাজ করতে হবে। তবে পুরোনো ফর্মুলা বা ধ্যানধারণা দিয়ে বদল আনা যাবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ নানা পরিবর্তন আসছে। তরুণদের চিন্তার পরিধি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, বাইরে থেকে আরোপিত কোনো কিছু গ্রহণ করা মানেই স্মার্টনেস বা আধুনিকতা নয়। নিজের শিকড়ের সন্ধান করতে হবে।

চূড়ান্ত পর্বে মনোনীত ১২টি প্রকল্পের মধ্য থেকে সৃজনশীলতা, সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা ও স্বীকৃতি হিসেবে তিনটি অসাধারণ উদ্যোগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ স্বীকৃতি তরুণ চেঞ্জমেকারদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, উদ্যোক্তা মনোভাব ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতার স্বীকৃতি। এ প্রকল্প ও উদ্যোগকে আরও টেকসইভাবে গড়ে তুলে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে তারা ব্র্যাকের 'সোশ্যাল আন্ত্রেপ্রেনার্স ফেলোশিপ'-এর সুযোগ পাবেন।

কার্নিভাল অব চেঞ্জ ২০২৫-এর প্রথম দিনটি ছিল স্বীকৃতি, সংলাপ ও উদযাপনের এক প্ল্যাটফর্ম, যা বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মের চেঞ্জমেকারদের ক্ষমতায়ন ও তাদের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করতে ব্র্যাকের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্ বলেন, আমাদের আইডিয়াটা ছিল দেশের প্রতিটি জেলা থেকে কিছু তরুণ চেঞ্জমেকার– যারা সমস্যা নিয়ে কথা বলবে না, যারা সমাধান নিয়ে কথা বলবে– এ রকম কিছু মানুষ তৈরি করা। পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমরা কাজটা করে যাচ্ছি। ফলে প্রায় দেড় হাজারের বড় একটা অ্যালামনাই গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এরাই তাদের লোকাল সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে।

ব্র্যাকের 'আমরা নতুন নেটওয়ার্ক' বা এএনএন কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ এ শিক্ষার্থীদের নিয়েই। জীবন-দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এএনএন এখন দেশের ১৭টি জেলা বিস্তৃত। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দুই হাজার ৬০০ জনের বেশি তরুণ প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এই তরুণ চেঞ্জমেকারদের মধ্যে অনেকে পেয়েছে গেটস ফাউন্ডেশন, নাসা এবং জাতিসংঘ থেকে নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। 'আমরা নতুন নেটওয়ার্ক'-এর অ্যালামনাইরা এখনও যুক্ত আছে এ প্ল্যাটফর্মে।

CamScanner

টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত বিকেন্দ্রীকরণ

ড. মো. শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ তার জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কেন্দ্রকেন্দ্রিক শাসন কাঠামো আর দেশের জন্য কার্যকর নয়। রাজধানী ঢাকার ওপর অতিরিক্ত চাপ, জেলা ও উপজেলার কাঠামোগত দুর্বলতা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দীর্ঘসূত্রতা এবং অঞ্চলের উন্নয়ন বৈষম্য এখন চরম সংকটে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশ শাসনে সফল, অর্থনীতিতে শক্তিশালী এবং নাগরিক সেবায় উন্নত-তাদের সবার ক্ষেত্রেই একটি বৈশিষ্ট্য অভিন্ন- বিকেন্দ্রীকরণ। আজকের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলছে, রাষ্ট্র যত বিকেন্দ্রীকৃত হয়, মানুষ তত বেশি সেবা পায়,উন্নয়ন তত বেশি হয় এবং আর ক্ষমতা তত বেশি জবাবদিহি হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে- বাংলাদেশ কি এখনো কেন্দ্রকেন্দ্রিক মডেলে আটকে থাকবে, নাকি পৃথিবীর সফল মডেলগুলোর অভিজ্ঞতায় নিজের পথ বদলাবে? অনেক লেখালেখি হচ্ছে যে, বাংলাদেশ এখনো কেন কেন্দ্রকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় চলছে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের কথায় আসি। ১৯৯২ সালে ভারতের সংবিধানে ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন ভারতকে করে তুলেছে বিশ্বের অন্যতম বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্র। আজ ভারতের প্রায় ৩০ লাখ স্থানীয় প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। গ্রামপরিষদ থেকে পৌরসভা পর্যন্ত-প্রতিটিই বাজেট অনুমোদন, স্থানীয় কর, অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দিল্লিতে আটকে নেই। উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরু হয় গ্রামেই। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সব ঢাকাকেন্দ্রিক। ভারতের বিকেন্দ্রীকরণের কারণে গ্রামীণ অবকাঠামো, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় কর্মসংস্থান- সবখানেই ব্যাপক উন্নতি। কিন্তু বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত হলেও তাদের হাতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। ভারতের শিক্ষা হলো কাগজে ক্ষমতা নয়, কার্যকর ক্ষমতা দরকার। তাই আমাদের অন্যান্য দেশের মতো বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে এগিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণেই প্রশাসনের গতি বেড়েছে জাপানে অনেক বছরে ধরে। জাপান দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্দেশ নয়, বাজেটিক স্বাধীনতাই প্রশাসনকে দ্রুত করে তোলে। জাপানের ১৭০০টি স্থানীয় সরকার ইউনিট নিজস্ব কর সংগ্রহ করে এবং ব্যয় নির্ধারণ করে। কেন্দ্র কেবল কো-অর্ডিনেট করে। এগুলো বিকেন্দ্রীকরণ এর ভালো উদাহরণ। এ কারণেই জাপানে একটি বিদ্যালয় বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করতে বছরক্ষেপ হয় না। স্থানীয় সরকার নিজস্ব শিল্পবিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। সেবা বৈষম্য কম উত্তর জাপান ও দক্ষিণ জাপান একই ধরনের উন্নয়ন ভোগ করে। যেজন্য বাংলাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব রাজস্ব কাঠামো তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছাড়া স্থানীয় সরকার কার্যকর হয় না।

দক্ষিণ কোরিয়াতে আঞ্চলিক উদ্ভাবনই জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি। দক্ষিণ কোরিয়া তার উন্নয়ন-যা 'কোরিয়ান মিরাকল' নামে পরিচিত ছিল শক্তিশালী আঞ্চলিক শাসনের ফল। প্রতিটি প্রদেশে রয়েছে- আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা, পরিবহন, শিল্পনীতি প্রণয়নের ক্ষমতা এবং কর সংগ্রহ ও ব্যয়ের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই আঞ্চলিক সিস্টেমের ফলেই সিউলের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েনি। ফলে বুসান, দেগু, গওাংজু-প্রতিটি শহর স্বতন্ত্র উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। যার অনুকরণে বাংলাদেশে রাজধানীকেন্দ্রিক উন্নয়ন টেকসই নয়; বিভাগীয় শহরগুলোকে নীতিনির্ধারণী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দ্বীপরাষ্ট্রকে রক্ষা করেছে বিকেন্দ্রীকরণ। ইন্দোনেশিয়া ১৯৯৯ সালে 'Big Bang Decentralization' নামে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেয়। যেখানে জেলার হাতে হস্তান্তর করা হয়- স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় অবকাঠামো, ভূমি ব্যবস্থাপনা, সেবাপ্রদান ব্যবস্থা এবং বাজেট ব্যয় প্রমুখ। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সারা দেশে সেবাপ্রদান ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে। দুর্নীতি কমে, সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। বাংলাদেশও জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানে বড় রাষ্ট্র; কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দিয়ে এই বিশাল জনগোষ্ঠী পরিচালনা সম্ভব নয়। এছাড়া জার্মানিতে আঞ্চলিক ক্ষমতাই জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বলা হয়। জার্মানির ফেডারেল কাঠামো আজ বিশ্বের অন্যতম সফল। ১৬টি রাজ্যের রয়েছে নিজস্ব-শিক্ষা নীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পুলিশ ব্যবস্থা, বাজেট ক্ষমতা ইত্যাদি। জার্মানির উন্নয়ন স্কেলে বৈষম্য কম থাকার অন্যতম কারণ কেন্দ্রের ক্ষমতা সমন্বয়ের মধ্যে সীমিত। উন্নয়ন পরিকল্পনা করে রাজ্যগুলো। বাংলাদেশ দলীয় কেন্দ্রায়ন নয়, প্রশাসনিক ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনই সুশাসনের পথ ধরে জনগণের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে গ্রাসরুটস ডেমোক্রেসিই সবচেয়ে বড় শক্তি। যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি অঙ্গরাজ্য, হাজারো কাউন্টি, টাউন ও সিটি-প্রতিটিই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর, পুলিশ, ব্যবসা লাইসেন্সিং- সবক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে একেক অঞ্চলে একেক রকম নীতি নিয়ে অগ্রগতি হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া প্রযুক্তি খাতে বিশ্বসেরা, টেক্সাস জ্বালানি ও কৃষিতে শক্তিশালী এবং নিউইয়র্ক আর্থিক খাতে প্রভাবশালী। এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিও বিকেন্দ্রীকরণ।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ওপর। বাংলাদেশ একটি নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। অর্থনীতি বড় হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, নগরায়ণ ত্বরান্বিত। কিন্তু প্রশাসনিক কাঠামো রয়ে গেছে ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরানো কেন্দ্রীভূত মডেলে। এখন সময় এসেছে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের কাঠামো পুনর্গঠনের। বিশ্বের অনেক দেশ প্রমাণ করেছে-কেন্দ্রীকরণ উন্নয়নকে পিছিয়ে দেয়, আবার বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নকে মানুষের হাতে তুলে দেয়। বাংলাদেশ যদি সমান সেবা, দ্রুত প্রশাসন, দৃঢ় অর্থনীতি এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চায়-তবে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া অন্য পথ নেই

আর আমাদের দেশে প্রতিটি সংকটের মূলেই রয়েছে কেন্দ্রীকরণ। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো এখনো 'ঢাকাকেন্দ্রিক'। এর ফলে তৈরি হয়েছে বেশকিছু দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা যেমন- রাজপথ, হাসপাতাল, স্কুল-সব সেবাই ঢাকামুখী। ঢাকার বাইরে চিকিৎসা সমস্যা, শিক্ষার মানের বৈষম্য, অবকাঠামোর ঘাটতি- এসবের মূল কারণ স্থানীয় সরকারের অক্ষমতা। ফাইল ঘোরাঘুরি ও ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাংলাদেশের পুরানো ঐতিহ্য। একটি উপজেলা সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন পেতে ঢাকা পর্যন্ত বহু ধাপ পাড়ি দিতে হয়। সময় নষ্ট হয়, খরচ বাড়ে। জেলা বা বিভাগীয় প্রশাসন স্বাধীন ক্ষমতাবান ইউনিট হিসেবে পরিলক্ষিত হয় না অনেক সময়। ফলে তারা নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে পারে না। মানুষ ঢাকাইকে একমাত্র সুযোগের কেন্দ্র মনে করে। শহর অকার্যকর হয়ে পড়ছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়, কিন্তু তাদের হাতে কার্যকর ক্ষমতা নেই- এটি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। সঠিক গণতন্ত্রের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশের জন্য সংস্কার-পরিকল্পনায় বিশ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাপান, জার্মানি, কোরিয়ার মতো স্থানীয় বাজেট সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষমতা দিতে হবে জেলা ও পৌরসভাকে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড গঠন গঠন করতে হবে। যেখানে শিল্পনীতি, পরিবহন, শহর পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন- সব বিষয়েই বিভাগ সিদ্ধান্ত নেবে। জেলা পর্যায়ে স্থায়ী জনবল, স্থানীয় ক্যাডার, নিজস্ব প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ প্রয়োজন। কেন্দ্র থেকে বদলি করে পাঠানো কর্মকর্তার ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও জেলা পরিষদের ক্ষমতা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করতে হবে। তাদের নিয়োগ, বাজেট, প্রকল্প অনুমোদনে স্বাধীনতা থাকা জরুরি। অনলাইন সেবা জেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে- ফাইল অনুমোদন, নির্মাণ অনুমতি, কর আদায়- সবই ডিজিটাল করতে হবে, যা বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। তবে এসব সেবার আরও উন্নয়ন করা এবং প্রযুক্তিগত ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। ইন্দোনেশিয়ার সাফল্যের ভিত্তি ছিল এই প্রযুক্তিগত বিকেন্দ্রীকরণ। তাই আমাদের এরকম পলিসি গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ওপর। বাংলাদেশ একটি নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। অর্থনীতি বড় হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, নগরায়ণ ত্বরান্বিত। কিন্তু প্রশাসনিক কাঠামো রয়ে গেছে ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরানো কেন্দ্রীভূত মডেলে। এখন সময় এসেছে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের কাঠামো পুনর্গঠনের। বিশ্বের অনেক দেশ প্রমাণ করেছে-কেন্দ্রীকরণ উন্নয়নকে পিছিয়ে দেয়, আবার বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নকে মানুষের হাতে তুলে দেয়। বাংলাদেশ যদি সমান সেবা, দ্রুত প্রশাসন, দৃঢ় অর্থনীতি এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চায়-তবে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া অন্য পথ নেই।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

CamScanner

Takeaway from COP30

Dropping explicit language on phasing out fossil fuels has been a great failure of the conference as it is the root cause of climate change and global warming

writes
Hasnat Abdul Hye

The thirtieth United Nations Climate Change Conference, (COP30) held in Belem, Brazil from November 10 to 21, concluded with a compromise agreement, meaning it fell short of expectations of the majority of participants. In a conference of a few major powers and many countries with little political and economic clout, compromise is always at the cost of the interests of the latter. This has been proved time and again in the annual meetings held under the UN Framework Conference for Climate Change (UNFCC) since-1995. The just concluded COP30 in Brazil has been no exception. Its outcome became a forgone conclusion when it was announced that United States would not send any delegation and China and India would not be represented by their head of state and government. These are the countries that are major contributors to adverse climate change leading to increasing global warming. The irony of their absence is that in recent years they have themselves experienced extremes in weather conditions, inflicting great sufferings to their own people and enormous loss to their economies. Because of the fine-tuning of the agenda by the host country Brazil, there was a sliver of hope that COP30's achievements would be reasonably satisfactory to all stakeholders. In the event, the fossil fuel lobby laughed all the way to the bank, leaving the objective of controlling emissions of fossil fuels, particularly CO2, on the backburner. A brief review of the agenda, the discussions, the sticking points and the compromise agreement may give an idea about how, why and to what extent the expectations of the global community to avoid the doomsday scenario of global warming increase of more than 1.5 degree centigrade above pre-industrial level have once again remained unfulfilled.

AGENDA OF COP30: COP30's agenda was shaped around Brazil's vision of shifting from negotiation to implementation and to accelerate climate action, based on the results of the first Global Stocks Take (GST-1) under the Paris agreement of 2015. The key agenda items of COP30 included: (1) Strengthening climate governance: Brazil called for more effective multilateral processes, faster decision-making and better alignment with realistic implementation.(2) Ambitious Nationally Determined Contributions (NDCs): Encouraging countries to adopt more ambitious climate targets and holding a stocktaking of current NDCs. (3) Adaptation.: Putting adaptation at the centre, including national adaptation plans, financing and following up on the Global Adaptation Goals. (4) Sustainable Development Goals linkages: Ensuring climate action is coherent with broader sustainable development and biodiversity protection. (5) Mobilising Finance: One of the most significant agenda item was climate finance to scale up support, especially for developing countries, for both mitigation and adaptation. Brazil promoted its Baku-to-Belem Roadmap to mobilise US$2.3 trillion by 2035.(6) Global Climate Action Agenda: Engaging non-state actors (civil society, business, cities) through six thematic sectors : energy, forests/biodiversity, agriculture, resilience, social development and enabling accelerating factors like finance, technology etc. (7) Fossil fuels and phase-out debate: Even though not a central item, fossil fuel transition became a highly contentious issue during negotiations. (8) Forests: Given the Amazon location of COP30, forest protection, deforestation and forest-based solutions were high priorities. Brazil announced the Tropical Forest Forever Facility (TFFF) to direct investment to forest-rich countries. (9) Trade and Climate: the Conference broached the intersection of climate policy and trade, including potential trade measures or carbon border adjustments. (10) Just Transition and Social Dimensions: Mechanisms to protect workers, indigenous peoples and communities in transition away from high- carbon industries.

KEY DISCUSSIONS AND DEBATES: Several major discussions dominated COP30.The most salient ones were: (a) Fossil Fuel Phase-out. The most divisive issue was the debate over phasing out fossil fuels. More than 80 countries pressed for explicit language in the final agreement calling for a roadmap to phase out coal, gas and oil. However, a bloc of oil-producing countries, including Arab Group, resisted this push, warning that targeting the energy sectors could derail the entire deal. In the end, the final negotiated text omitted any binding fossil fuel phase-out language. To salvage the situation, the Brazilian presidency announced two voluntary roadmap outside the formal UNFCC process: one for a just, orderly and equitable transition away from fossil fuels; and another for forest and climate action.

Climate Finance. Finance was central to COP30. Brazil emphasized mobilising both public and private resources. The Baku-to-Belem Roadmap, introduced earlier in 2025, remained a cornerstone, targeting US$ 1.3 trillionth annually by 2035.Part of the discussion focussed on adaptation finance: how to scale up funding to help vulnerable countries cope with the impact of climate change.

Forest Protection. Given the Amazon backdrop, forests featured prominently in the Conference. Brazil launched the Tropical Forests Forever with initial pledges of US$ 5.5 billion from countries like Norway, Germany, Indonesia and France. The aim is to compensate forest-rich countries for preserving their forests. Yet, despite these pledges, negotiations failed to agree on a binding roadmap for zero deforestation by 2030, disappointing many indigenous representatives and environmental groups.

Adaptation and Resilience. COP30 elevated adaptation as delegates discussed national adaptation plans, resilience for cities and infrastructure, water systems and social development. The Conference outcome included a commitment to triple adaptation finance by 2030.

Just Transition and Social Dimensions. Recognising the social impact of climate transitions, COP30 introduced a just transition mechanism to support workers and communities affected by the shift away from high-carbon industries. There was also progress on gender equity with COP30 adopting, for the first time, a gender action plan in its decisions.

Trade and Climate. Another major thread was the intersection of climate policy and trade. Brazil proposed a Climate Coalition with carbon markets and a border carbon adjustment mechanism , potentially penalising goods from countries not aligned with the coalition's emissions standard.

Role of Indigenous People and local Communities. COP30 emphasized the role of indigenous people and local communities in climate action. Brazil's presidency called for their inclusion and recognition. However, many Indigenous delegates protested the lack of meaningful engagement, particularly in decisions on forests and land rights.

THE BONES OF CONTENTION: While COP30 managed to reach a compromise agreement at the end, the obstacles and differences of views that hindered consensus and progress at every stage merit a brief recapitulation.

(1) *Fossil Fuel Resistance.* As noted earlier, oil and gas-producing countries strongly opposed binding fossil fuel phase-out resolutions. Their veto effectively blocked more ambitious and binding commitments, leaving only a voluntary roadmap. (2) *Geo- political fragmentation.* The summit took place in the midst of difficult geopolitical conditions .Tensions between America and Europe over Ukraine war has arrayed Russia and China against the Western alliance. To make matters worse, Trump administration's foreign and trade policies have created problems within the western alliance itself. The perennial divide between developed North and developing South have pitted countries of the two blocs against each other, making consensus decisions difficult. Finally, energy producers and conservationists have further exacerbated the divide.

(3)*Institutional strain in the UNFCC.* The inability to reach agreement on fossil fuels and deforestation has raised questions about the effectiveness and structure of the UN climate negotiation system. Some observers have pointed out that a few countries continue to hold disproportionate veto power, undermining collective action.

(4) *Scientific Integrity Concerns.* The final text did not reaffirm the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) as the definitive 'best available science.' Instead, it broadened accepted references to include regional or national studies, raising alarm among scientists that global standards of scientific theory may be weakened. (5) *Ambiguous Finance Commitments.* Although adaptation financing was pledged, details remained vague. Sources and mechanisms for delivering the tripled adaptation finance were not clearly defined.

THE COMPROMISE AGREEMENT: Despite deep divisions, COP30 concluded with a compromise agreement. But it falls far short of what is needed to address the climate crisis. A summary of the conclusions, their impacts and future implications is presented here: (a) A package of decisions strengthening aspects of the Paris Agreement was agreed upon which cover mitigation, adaptation, finance, technology, and capacity building. (b) Brazil committed to developing voluntary road maps, one for fossil fuel transition and another for forest and climate, setting examples for other countries. (c) With the launching of Tropical Forest Forever Facility, the Forest Finance has been launched with US$ 5.5 billion pledged initially, aiming to channel funds to forest- rich countries. (d) A commitment to triple adaptation funding by 2030 has been made. (e) Agreement has been reached for the establishment of a mechanism to support workers and communities transitioning from fossil fuel-dependent economies. A proposal for a Climate Coalition including carbon markets and border carbon adjustments was floated and postponed for future discussion and decision.

END NOTE: The decisions made in the COP30 are modest and incremental. They are by no means transformational, which many think is urgently called for. COP30 has taken a step forward but far from the bold action needed to achieve the target of keeping global warming to 1.5 degree centigrade above pre-industrial age. Dropping explicit language on phasing out fossil fuels has been a great failure of the conference as it is the root cause of climate change and global warming.

hasnat.hye5@gmail.com

CamScanner

Global trade moderation and Bangladesh

The country is going to witness a year of sluggish trade in goods which will have some negative impact on the growth of GDP

writes

Asjadul Kibria

The calendar year 2025 is now set to enter its final month tomorrow. In other words, just a month from now, the world will see the start of another year. The annual stock-taking of global economic performance is already underway, although only relevant data for the first three quarters (January-September) is available. In this connection, the World Trade Organization (WTO) released the latest Goods Trade Barometer on Friday last. The barometer is a composite leading indicator for global trade that provides real-time information on the course of trade in goods relative to recent trends. Usually, the barometer predicts trade developments two to three months ahead. The latest barometer indicates a possible development of global trade in the last quarter of the current year.

The key message of the latest WTO Goods Trade Barometer is that global goods trade growth is set to moderate in the last quarter, leading to slower growth in the last half of the year. The surge in global trade in the first half was mainly driven by frontloading of imports ahead of expected tariff hikes and by rising demand for AI-related products, according to the barometer index analysis. The overall barometer index fell to 101.8 in September, down from 102.2 in June and below the quarterly trade volume index, which reflects actual merchandise trade developments.

There are six component indices of the barometer, and all are above their standard baseline value of 100 except for the agricultural raw materials index (98.0), which has been in contraction since the start of the year. The indices for air freight (102.7) and container shipping (101.7) remain above trend. Nevertheless, these two indices have declined over the last three months, indicating a slowdown in global goods transportation. In other words, trade volume is likely to go through a downtrend in the coming days. The WTO last month predicted that merchandise trade, in terms of volume, may register 2.4 per cent growth in 2025 and 0.5 per cent in 2026. The slower growth projection is driven by higher tariffs and trade policy uncertainty in the second half of 2025 and in 2026.

The indices for automotive products (103.0) and electronic components (102.0) remained constant over the same period. It also indicates moderate growth prospects. Finally, the new export orders index (102.3) surpassed the baseline value of 100 in the second quarter, after some volatility at the end of 2024 and the start of 2025.

So, the overall reading of the indices suggests a moderation in global merchandise trade growth this year.

Earlier last month, the UN Trade and Development (UNCTAD) in its global trade update showed that the world trade expanded by about $500 billion in the first half of 2025, despite volatility, policy shifts and persistent geopolitical tensions. "Momentum remained strong into the third quarter, even as growth patterns varied across regions and sectors," it added.

UNCTAD also said that the trade growth continued in the third quarter, with goods expected to expand by about 2.5 per cent quarter over quarter and services accelerating sharply to around 4 per cent. As full data for the third quarter trade were not available at the time of releasing the UNCTAD update, the UN organisation issued a nowcast, a forecast of what is immediately expected, for the third quarter. It also said that barring major adverse shocks in the final months of 2025, global trade is projected to surpass its 2024 record levels. Last year, the value of global merchandise trade stood at US$24.5 trillion, posting modest growth of 2 per cent over 2023.

UNCTAD was of the view that despite turbulence from shifting US trade policy, global trade dynamics have so far shown limited disruption.

However, uncertainty over future policy remains a key risk.

"Geopolitical instability also continues to weigh on trade, with persistent conflicts that could further disrupt regional dynamics and heighten concerns over energy and food security," it added in its October update report.

The moderation of the global trade in goods will also impact countries like Bangladesh as their exports are dependent on the movement of the global market. Already, the country's trade in goods registered a modest 2 per cent growth in the first nine months of the current year over the previous year. Statistics available with Bangladesh Bank showed that total trade in the January-September period of 2025 stood at $82.79 billion, which was $81.14 billion in the same period of 2024.

The official statistics also showed that merchandise exports of the country increased by 4.74 per cent in the first nine months of the current year, whereas the imports remained almost the same, reflecting weak domestic demand.

As the country enters the election-centric political business cycle, weak domestic demand will persist for a couple of months before and after the election in February of the next year.

While the import is correlated with domestic demand, the export is linked to the international market, which has already become somewhat volatile due to Trump's tariff policy.

The US President initially imposed a 35 per cent reciprocal tariff on Bangladesh, which later fell to 20 per cent after hectic negotiations with several commercial offers to the US.

The new tariff rate comes into effect in August, and the primary impact will be visible by the end of the year.

As China is the leading trade partner, mainly because it is the largest source of imports in Bangladesh, despite a decline in domestic demand, total imports from China will post moderate growth by the end of the year.

Overall, Bangladesh is going to witness a year of sluggish trade in goods which will have some negative impact on the growth of country's gross domestic product (GDP).

asjadulk@gmail.com

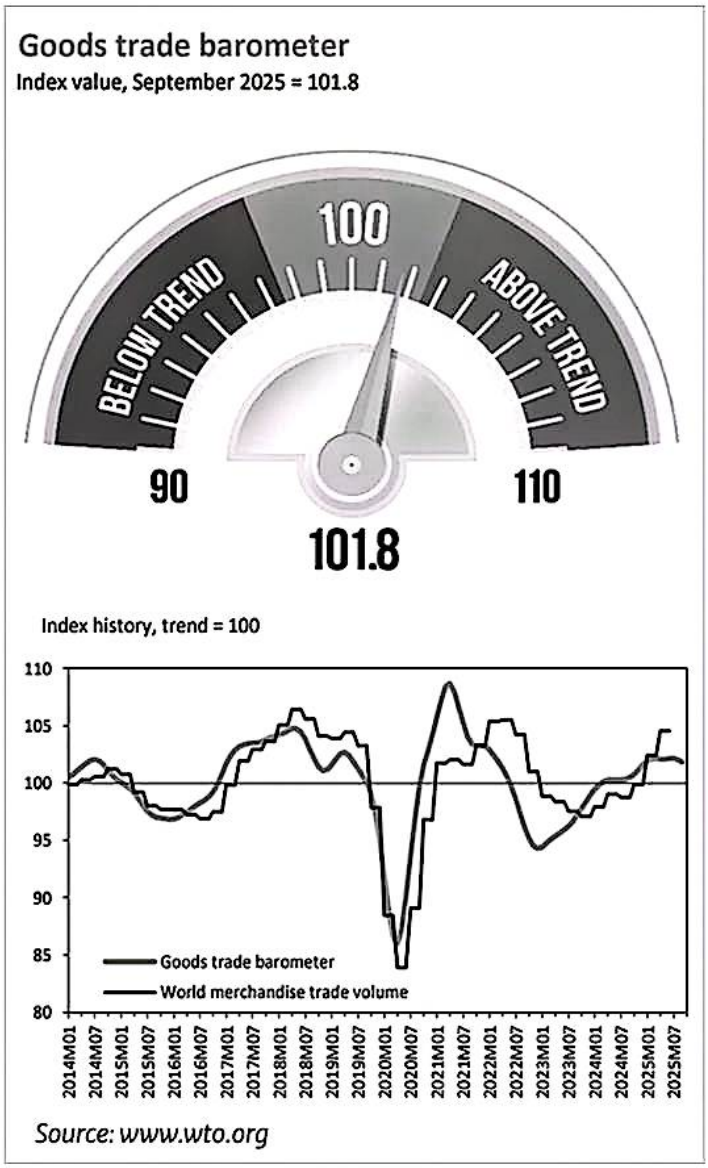

Source: www.wto.org

CamScanner

খেলাপির সংকট কাটাতে ৫-১০ বছর লাগবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত হার এক-তৃতীয়াংশ পেরিয়ে বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, 'এ পরিস্থিতির রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়।

আহসান এইচ মনসুর

এ সংকট কাটিয়ে উঠতে পাঁচ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে। দুই বছর আগে মনে করেছিলাম, খেলাপি ঋণ ২৫ শতাংশ হতে পারে। এখন দেখি তা ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে।'

গতকাল শনিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৫'-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তব্য দেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এনামুল হক, হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ, বিএসএমএর সভাপতি ও জিপিএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং এবিবি চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন।

দেশের খেলাপি ঋণ বাড়ছে জানিয়ে অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, 'প্রতি প্রান্তিকে যখন নতুন তথ্য পাই, খেলাপি ঋণের নতুন নিয়ম কার্যকর হয়। তখনই দেখা যাচ্ছে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। দুই বছর আগে আমার ধারণা ছিল, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার ২৫ শতাংশের মতো হবে। তখন সরকার বলেছিল তা ৮ শতাংশ। এখন দেখছি এটি এরই মধ্যে ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে।'

গভর্নর বলেন, 'দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতকে বহুদিন এই সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। ধাপে ধাপে এগোতে হবে। পুরোপুরি উত্তরণে অন্তত পাঁচ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে।'

তবে আমদানি নিয়ে শঙ্কা নেই জানিয়ে গভর্নর বলেন, রমজান মাস সামনে রেখে পর্যাপ্ত ডলার মজুদ রয়েছে এবং এরই মধ্যে গত বছরের তুলনায় ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশি এলসি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

অর্থনৈতিক সম্মেলনে গভর্নর

- আস্থাহীনতা বিনিয়োগ থামিয়ে দিচ্ছে : বিআইডিএস ডিজি
- উচ্চ সুদের হারে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৬% : এ কে আজাদ
- টিকে থাকার লড়াইয়ে স্টিল-সিমেন্ট খাত : বিএসএমএ সভাপতি

প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বেকারত্ব বাড়ানো সমাধান নয় : মির্জা ফখরুল

ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে মনোভাব পরিবর্তন দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিগত ১৫ বছরে যারা লুটপাটে জড়িত ছিল তাদের শাস্তি দিন, কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বেকারত্ব তৈরি করা কোনো সমাধান নয়। গতকাল শনিবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন করা দরকার। তাদের বিশ্বাস করতে হবে। লুটপাটে যারা জড়িত তাদের শাস্তি দিন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে কেন বেকারত্ব তৈরি করছি? এগুলো ভাবতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক পথরেখা নয়, রাজনৈতিক পথরেখাও তৈরি করতে হবে। একটা দেশ যেখানে সব মানুষ তারা অন্তত একটা বেটার লিভিংয়ে থাকবে, ভালো অবস্থায়

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ৫

CamScanner

বাংলাদেশ ব্যাংকের সবুজ তহবিলে কালো থাবা

মো. জয়নাল আবেদীন ▷

সবুজ ব্যাংকিং-১

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সফরবিলাস
- ব্যাংককে পরিশোধ করতে হচ্ছে গ্রাহকের দেনা
- ডলার সংকটে খেলাপিতে পরিণত একাধিক ব্যাংক
- এস আলমের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিলও

পরিবেশ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)। যার লক্ষ্য ছিল শিল্প খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা। রাখা হয়েছিল দ্বিস্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থাও। কিন্তু সেই নিরাপত্তার দরজা দিয়েই চোরেরা ঢুকে পড়ল। আর সবুজ টাকার মোহে হারিয়ে গেল দায়িত্ব ও বিবেক।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৬ সালে ২১০ মিলিয়ন ডলারের এই রিফাইন্যান্সিং স্কিম চালু করে, পরে এতে আরো ২০০ মিলিয়ন ইউরো যোগ হয়। নিয়ম ছিল রপ্তানি ও উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে, আর সেই ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনরর্থায়ন সুবিধা পাবে। তবে তার আগে সরেজমিনে প্রকল্প যাচাই করতে যান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। কাগজে-কলমে যাচাইয়ের নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা পরিণত হয়েছিল ভ্রমণবিলাস আর অফিস কর্মীদের পিকনিক বা সফরের উৎসবে। কেউ কেউ প্রকল্প পরিদর্শনের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি দিয়েছেন চটকদার শিরোনামে। অথচ যেসব প্রকল্পে ঋণ গেছে, তার অনেক প্রকল্পের নামেই কেবল টিকে আছে অস্তিত্ব। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের অধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই ফান্ড থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছে। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল) থেকে মাত্র ১.৩১ শতাংশ সুদে ইনফিনিয়া স্পিনিং মিলস নেয় দুই কোটি ১০ লাখ ডলারের বেশি। একই মালিকানাধীন ইনফিনিয়া স্পিনিং মিলস-২ নেয় আরো দুই লাখ ৭৫ হাজার ডলার এবং ৩৩ লাখ ইউরো। কিন্তু এখন তা খেলাপি। ২০২১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ থেকেও এস আলমের মেয়েজামাই বেলাল আহমেদের প্রতিষ্ঠান

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

CamScanner

কৃষিতে উৎপাদনশীলতার নতুন দিগন্ত

জিনিয়া তাবাসসুম

বাংলাদেশের কৃষি আজ আর লাঙল-জোয়ালের গল্পে সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে কৃষির চিত্র বদলে গেছে একেবারে ভেতর থেকে। নতুন প্রজন্মের হাতে উঠে এসেছে ড্রোন, সেন্সর, মোবাইল অ্যাপ ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা, যা কৃষিকে করে তুলছে আরও আধুনিক, দক্ষ ও তথ্যনির্ভর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য জমি কমে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্মার্ট কৃষিই এখন সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এটি শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়ায় না, বরং কৃষিকে সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং ভবিষ্যৎমুখী শিল্পে রূপান্তরিত করছে। দীর্ঘদিন ধরে যে দেশে কৃষিকে 'পুরনো এবং লোকজ পেশা' হিসেবে দেখা হতো, সেখানে এখন প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কৃষি তরুণদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। স্মার্ট কৃষি আজ শুধু ফলন বাড়ানোর গল্প নয়; বরং এটি নতুন প্রজন্মকে উদ্ভাবন, সম্ভাবনা ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথ দেখাচ্ছে। কৃষির প্রতিটি ধাপ- বীজ বপন, সার প্রয়োগ, সেচব্যবস্থা, রোগ শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত- সবকিছুতেই প্রযুক্তির ছোঁয়া এসেছে।

স্মার্ট প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তথ্য। সেন্সর, স্যাটেলাইট ডেটা, অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এখন একজন কৃষক খুব সহজেই জানতে পারেন মাটির আর্দ্রতা, পুষ্টিমান, পিএইচ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা ফসলে রোগের ঝুঁকি। মাটির সেন্সর দেখিয়ে দেয় কখন সেচ প্রয়োজন এবং কতটুকু সার লাগবে। এতে যেমন অপচয় কমে, তেমনি বাড়ে উৎপাদন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যার ছবি বা ডেটা বিশ্লেষণ করে দ্রুত রোগ শনাক্ত করে দেয় এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেয়। যে কৃষি এক সময় পুরোপুরি অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল ছিল, তা আজ বিজ্ঞান, ডেটা এবং রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। ড্রোন প্রযুক্তি কৃষিতে এনেছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আকাশ থেকে তোলা ছবির মাধ্যমে জমির প্রতিটি অংশ বিশ্লেষণ করা যায় সহজেই। কোথায় ফসল দুর্বল, কোন জায়গায় রোগ ছড়িয়েছে, কোথায় সেচ কম পড়েছে- এসব তথ্য ড্রোনের মাধ্যমে খুব দ্রুত পাওয়া যায়। ফলে কৃষক আর অপেক্ষায় থাকেন না রোগ দেখা দেওয়ার; বরং রোগ ছড়ানোর আগেই সতর্ক হওয়া সম্ভব হয়। ড্রোন যেন এখন মাঠের এক নতুন 'চিকিৎসক', যে ফসলের সমস্যা প্রথম থেকেই চিনে নিতে পারে।

শুধু ড্রোন বা সেন্সর নয়, মোবাইল অ্যাপও তরুণ কৃষকদের কাছে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়ার অ্যাপ, রোগ শনাক্তকরণ সফটওয়্যার, স্মার্ট সেচ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাটির বিশ্লেষণ অ্যাপ- সবকিছু ব্যবহার করে খুব সহজেই কৃষক জানতে পারেন জমির অবস্থা ও করণীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জলবায়ু-স্মার্ট কৃষিও এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। লবণ সহনশীল ধান, খরা সহনশীল ফসল, ভাসমান কৃষি এবং বর্ষানির্ভর আধুনিক চাষাবাদ- এসব প্রযুক্তি বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করছে। কৃষি কেবল আধুনিক হচ্ছে না, বরং পরিবেশের সঙ্গে আরও টেকসই ও মানানসই হচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণও কৃষিতে এনেছে এক বিপ্লব। একসময় যে কাজ করতে সারাদিন লেগে যেত, এখন কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার বা ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টাতেই শেষ করা যায়। এতে শ্রমের চাপ কমছে, সময় বাঁচছে এবং উৎপাদন ব্যয়ও কমে আসছে। এসব যন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে গ্রামে তৈরি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থান, যা তরুণদের কৃষি খাতে আরও আকৃষ্ট করছে। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। সৌরচালিত ধান শুকানো ঘর, সৌর ঠাণ্ডা কক্ষ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট- এসব প্রযুক্তি কৃষিকে আরও সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব করছে। উৎপাদন ক্ষতি কমছে, সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে এবং কৃষিপণ্যের মান বজায় থাকছে দীর্ঘসময়। ভবিষ্যতের কৃষি আরও আধুনিক হতে চলেছে। রোবটিক্স ও অটোমেশন এখন গবেষণার পর্যায়ে থাকলেও খুব দ্রুতই তা মাঠে ব্যবহৃত হবে- স্বয়ংক্রিয় ধান কাটার রোবট, আগাছা পরিষ্কারের রোবট, অটোমেটেড গ্রিনহাউস- সবকিছুই উৎপাদনকে আরও দ্রুত, নির্ভুল ও সাশ্রয়ী করে তুলবে।

কৃষির সঙ্গে ডিজিটাল মার্কেটিংও যুক্ত হয়েছে নতুন সম্ভাবনা হিসেবে। তরুণরা এখন শুধু মাঠেই নয়, অনলাইনেও কৃষিকে তুলে ধরছেন নতুনভাবে। চেল্লো, শপআপের মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে কৃষিপণ্য সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমছে এবং কৃষকের আয় বাড়ছে।

তবে স্মার্ট কৃষির সামনে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রযুক্তির খরচ তুলনামূলক বেশি, অনেক এলাকায় ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ সুবিধা সীমিত এবং অনেক কৃষক এখনও প্রযুক্তির ব্যবহারে পুরোপুরি দক্ষ নন। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কৃষি যে একটি বড় পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে তা নিশ্চিত। নতুন প্রজন্মের আগ্রহ, শেখার মানসিকতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা কৃষিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

স্মার্ট কৃষির এই অগ্রগতি শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির গল্প নয়; এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের শক্ত ভিত। যে কৃষিকে একসময় অতীতের পেশা মনে করা হতো, সেই কৃষিই আজ প্রযুক্তির হাত ধরে ভবিষ্যতের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হয়ে উঠছে। তরুণরাই হবে এই পরিবর্তনের চালিকাশক্তি, যারা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাঠের মাটিকে বদলে দিতে পারে নতুন ভাবনা, উদ্যম ও দক্ষতায়।

জিনিয়া তাবাসসুম : শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

CamScanner

শেয়ার বিজ

বিসিআইয়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত চালিকাশক্তি এসএমই খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) উদ্যোগে বিসিআই বোর্ডরুমে গতকাল শনিবার 'এসএমই ফাইন্যান্সিং : অপারচুনিটি অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)।

আলোচক ও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক শাহানাজ পারভীন, সীমান্ত ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার, সঞ্জয় পাল। কর্মশালায় বিসিআই সদস্য, বিভিন্ন ব্যাংক, উইমেন চেম্বার, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বিটাকের প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

বিসিআইয়ের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, 'বিসিআই নিয়মিতভাবে দেশের শিল্পায়নসহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসাবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই কর্মশালা।' তিনি বলেন, এসএমই খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত চালিকাশক্তি, যেখানে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০ শতাংশ এই খাত থেকে আসে এবং জিডিপিতে অবদান ২৫ শতাংশের বেশি। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরও বলেন, 'এসএমই ফাইন্যান্সিং বড় চ্যালেঞ্জ হলেও এর মধ্যেই রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। এই খাতে সহজ অর্থায়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ আগামী দশকে একটি শক্তিশালী উদ্যোক্তা-নির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হবে।' প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মুসফিকুর রহমান বলেন— 'বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই সেক্টরের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা আয়োজন, অর্থায়নের জটিলতা নিরসন এবং পণ্যের বাজারজাতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে।

তিনি এসএমই ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং আগামী ৭ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া

এসএমই মেলায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। এছাড়া বিসিআইয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে কমন ইস্যুতে যৌথভাবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রথম সেশনে শাহানাজ পারভীন বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৭ মার্চ জারিকৃত সিএমএসএমই মাস্টার সার্কুলারের আলোকে এসএমই ফাইন্যান্সিংয়ের উল্লেখযোগ্য সুযোগসমূহ— নতুন উদ্যোক্তা, স্টার্ট-আপ, নারী উদ্যোক্তা, পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন।

দ্বিতীয় সেশনে সঞ্জয় পাল 'অ্যাক্সেস টু এমএসএমই ফাইন্যান্স অ্যান্ড প্রোগ্রেস অব ডিজিটাল এমএসএমই ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ডিজিটাল এমএসএমই ফাইন্যান্সের অগ্রগতি, ব্যাংক থেকে এমএসএমই ঋণ পাওয়ার উপায় এবং ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিষয়ে আলোকপাত করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সেশনটিও ছিল অত্যন্ত ইন্টারঅ্যাকটিভ।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে অংশগ্রহণকারীদের মতামত/ফিডব্যাক সংগ্রহ করা হয়। পরে বিসিআইয়ের পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা এবং বিসিআইয়ের সিএমএসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ইসমাত জেরিন খান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

CamScanner

শেয়ার বিজ
The Daily Share Biz

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঘটনার দ্রুত বিস্ফোরণ

সানিয়া তাসনিম

বাংলাদেশের সমাজ যেন এক অন্তহীন স্রোতস্বিনী নদী—যার বুকে ভেসে চলে ইতিহাস, স্মৃতি, বেদনা ও প্রতিবাদের তরঙ্গ। কখনও শান্ত, কখনও উত্তাল। একটু অন্যায়, সামান্য অবহেলা অথবা কোনো সিদ্ধান্তের ভুল সুর—এই নদীর জল যেন মুহূর্তেই ঘোলা হয়ে ওঠে, আর মানুষের অনুভূতির ঢেউ ছুটে আসে তীর ভাঙতে। যেন মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা বহু বছরের চাপা ক্ষোভ এক ফোঁটা ঘটনার স্ফুলিঙ্গেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যে এক প্রবল সামাজিক প্রবণতা চোখে পড়ে—তা হলো কিছু ঘটলেই আন্দোলন। বড় ঘটনা কিংবা ছোট, রাষ্ট্রীয় নীতির হেরফের, অর্থনৈতিক চাপ, শিক্ষাব্যবস্থার জটিলতা, কিংবা কোনো সামাজিক অবিচার—মানুষ দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে, আওয়াজ তোলে, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে। এ যেন একদিকে গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভাস, অন্যদিকে জমে থাকা অবিশ্বাস, হতাশা ও অনিশ্চয়তার প্রতিফলন।

বাংলাদেশে আন্দোলন নতুন নয়; বরং জাতীয় সত্তার গভীরে বোনা এক চিরন্তন ছাপ। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান—প্রতিটি ধাপে জনগণের প্রতিরোধের আগুনই পথ দেখিয়েছে পরিবর্তনের। তাই মানুষের মনের ভেতর জন্মেছে প্রতিবাদের এক নীরব ঐতিহ্য, যা আজও সমাজকে নাড়া দেয়। তবে বর্তমান সময়ে আন্দোলনের রূপ পাল্টে গেছে।

সামাজিক মাধ্যমের যুগে প্রতিক্রিয়া আগুনের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ছোট একটি ভিডিও, একটি পোস্ট বা গুজব মুহূর্তেই লাখো মানুষের চোখে পৌঁছে যায়। তথ্যের প্রবল স্রোত আবেগকে উত্তেজনায় রূপান্তরিত করে, আর উত্তেজনা একসময় সংগঠিত আন্দোলনে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাহীনতা—এই প্রবণতার মর্মস্থল। অনেকেই বিশ্বাস করেন, অভিযোগ বা সমস্যার সমাধান যথাসময়ে হয় না; ফলেই মানুষ মনে করে, রাস্তায় নেমে কথা বলাই দাবি আদায়ের একমাত্র কার্যকর ভাষা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম—যারা নিজের অধিকার, মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি স্পষ্ট অবস্থানে থাকে—তারা দ্রুত প্রতিবাদে সংগঠিত হয়।

তবে এর গভীরে রয়েছে মানসিক কারণও। যখন সমাজ দীর্ঘদিন ধরে সংকট, দুশ্চিন্তা ও চাপের বোঝা টেনে বেড়ায়, তখন মানুষের মন সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ছোট ঘটনা তখন বড় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

এই বাস্তবতায় 'কিছু ঘটলেই আন্দোলন' কেবল এক রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ নয়; বরং ইতিহাস, আবেগ, প্রত্যাশা, আস্থাহীনতা এবং সমাজের সমষ্টিগত মানসিকতার জটিল সমন্বয়। এটি আমাদের সময়ের এক গভীর, প্রগাঢ় এবং সত্য প্রতিচ্ছবি—যেখানে প্রতিটি কণ্ঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকে পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বাংলাদেশে 'কিছু ঘটলেই আন্দোলন'—এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে বহুস্তরীয় কারণ, যা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা একটি প্রধান কারণ। অনেক নাগরিক মনে করেন, অভিযোগ বা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সাড়া পাওয়া কঠিন। তাই অধিকার আদায়ের কার্যকর পথ হিসেবে তারা আন্দোলনকেই বেছে নেন। জনমতের এই আস্থাহীনতা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হওয়ায়, ক্ষুদ্র ইস্যুও দ্রুত বড় আকৃতি ধারণ করে।

অর্থনৈতিক চাপ ও বৈষম্য বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রবণতাকে তীব্র করে তুলেছে। মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, কম বেতনে উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়—এসব বিষয় মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ায়। দৈনন্দিন জীবনে চাপ বাড়তে বাড়তে ছোট একটি ঘটনা মানুষের সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে এবং তা প্রতিবাদে রূপ নেয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি তাদের বাস্তব সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়।

সামাজিক মাধ্যমের তাৎক্ষণিক প্রভাব আধুনিক আন্দোলনের গতিপথ বদলে দিয়েছে। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব বা মেসেঞ্জারের গ্রুপচ্যাট—কোনো ঘটনার ভিডিও বা পোস্ট কয়েক মিনিটেই কয়েক লাখ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে আবেগ খুব দ্রুত উত্তেজনায় রূপ নেয় এবং সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যায়। বহু সময় সামাজিক মাধ্যম তথ্যকে বাড়িয়ে তোলে বা একপাক্ষিক করে। ফলে মানুষের প্রতিক্রিয়াও তীব্র হয়।

আবার তরুণ প্রজন্মের সক্রিয়তা ও সচেতনতা এই আন্দোলন প্রবণতাকে আরও দৃঢ় করে। তরুণরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবেন, অন্যায়ের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখান এবং পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে নিজেদের ভূমিকা গুরুত্ব দেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের তরুণ সমাজ সবসময় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা এখনও অব্যাহত।

আরও কিছু কারণ হলো দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক চাপ ও মানসিক ক্লান্তি। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি, সেবাবঞ্চনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওঠানামা—এসব কিছুর কারণে মানুষের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। তখন একটি ছোট ঘটনা বৃহৎ অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়।

সমষ্টিগত স্মৃতি ও সংস্কৃতিও একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ইতিহাস আন্দোলন ও প্রতিরোধে সমৃদ্ধ। ফলে মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে এক ধরনের 'প্রতিবাদ সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে, যা আজকের ঘটনাগুলোকেও আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং এই প্রবণতা শুধু তাৎক্ষণিক উত্তেজনা নয়—বরং সামাজিক বাস্তবতা, দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার সম্মিলিত প্রতিফলন।

বাংলাদেশে 'কিছু ঘটলেই আন্দোলন'—এই প্রবণতা সাম্প্রতিক সময়ে যেন আরও ঘন ঘন দেখা যায়, যা সমাজে একাধিক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং তা এখন একটি গভীর সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের লক্ষণে পরিণত হয়েছে। প্রথমত, স্বাভাবিক জনজীবনের বিঘ্ন একটি বড় এবং সরাসরি দৃশ্যমান সমস্যা। কোনো ইস্যু কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হলেই সড়ক বন্ধ হয়ে যায়, গণপরিবহনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যানজট বা পরিবহন সংকটে মানুষ কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য থেমে যায়, বাজারে সরবরাহ কমে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি সেবা—বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, অগ্নিনির্বাপণ—প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়, যা অনাকাঙ্ক্ষিত মানবিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

অর্থনৈতিক ক্ষতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। প্রতিদিনের উৎপাদন, শিল্পকারখানার কার্যক্রম, পরিবহন ও বাণিজ্য থেমে গেলে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, রাস্তার হকার, দিনমজুর—এই বৃহত্তম অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের প্রতিদিনের আয়ে বাধা সৃষ্টি হলে পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে ওঠে।

এছাড়া ঘন ঘন আন্দোলনের ফলে সমাজে উত্তেজনা, অস্থিরতা ও ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়। সাধারণ মানুষ মনে করে যে কোনো সময় পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে—যা তাদের মানসিক সুস্থতার ওপরও প্রভাব ফেলে। সমাজে বিভক্তি বাড়ে; রাজনৈতিক, প্রজন্মগত এবং শ্রেণিগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে একটি অনিশ্চয়তার আবহ স্থায়ী হয়ে যায়।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও, বাস্তবে অনেক সময় সেগুলো সংঘর্ষ, ভাঙচুর বা দুর্ঘটনার দিকে গড়ায়। উত্তেজনা বাড়লে এক মুহূর্তেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এতে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ন হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গঠনমূলক সংলাপের দুর্বল হয়ে পড়া। যখনই মানুষ সমস্যা সমাধানের প্রথম পথ হিসেবে আন্দোলনকে বেছে নেয়, তখন আলোচনার সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের মধ্যে আস্থার সেতু ভেঙে যায়। এতে সমাধানমূলক প্রক্রিয়ায় জটিলতা বাড়ে এবং সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সব মিলিয়ে, আন্দোলনের গণতান্ত্রিক গুরুত্ব আছে—তবে ঘন ঘন ও অনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়।

বাংলাদেশে 'কিছু ঘটলেই আন্দোলন'—প্রবণতা কমানোর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি, বহুমাত্রিক এবং নীতিনির্ভর সমাধান। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা পুনর্গঠন করা অপরিহার্য। প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। যেকোনো সমস্যা বা অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করা গেলে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামার আগে প্রাতিষ্ঠানিক সমাধানের পথ ব্যবহার করবে। এ জন্য অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সময়সীমাবদ্ধ সমস্যা সমাধান ব্যবস্থা (Service Delivery Timeline) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর নিয়মিত মূল্যায়ন জরুরি।

গঠনমূলক সংলাপের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা উচিত। এতে বিভিন্ন সংকট শুরু হওয়ার আগেই সমাধান বের করা যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়লে উত্তেজনা কমবে এবং আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে।

সামাজিক মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভুয়া তথ্য, গুজব বা উত্তেজক পোস্ট অনেক সময় ছোট ঘটনা বড় করে তোলে। তাই ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে হবে—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ জরুরি। পাশাপাশি, সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে ভুয়া তথ্যের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক চাপ কমাতে টেকসই নীতিমালা দরকার। বেকারত্ব কমানো, দক্ষতা বিকাশ, ন্যায্য বাজারব্যবস্থা, পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—এসব বিষয় মানুষকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল করে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকলে মানুষ তড়িঘড়ি করে উত্তেজিত হয় না; বরং সমাধানের জন্য যুক্তিসঙ্গত পথ বেছে নেয়।

তরুণদের ইতিবাচক অংশগ্রহণের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন। তাদের সামাজিক উদ্যোগ, উদ্ভাবন, নেতৃত্ব এবং নীতিনির্ধারণী আলোচনায় যুক্ত করলে তারা পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে নিজেদের ভূমিকা দেখতে পায়। এতে হঠাৎ ক্ষোভ কমে আসে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণ বাড়ে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানবিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংলাপমূলক ও সংযত আচরণ টানাপোড়েন কমায়। রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হলে অস্থিরতা কমে যায়।

সমাধান কোনো একক পদক্ষেপে সম্ভব নয়; বরং আস্থা, সংলাপ, অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও নীতিনির্ভর ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়াসই একটি স্থিতিশীল ও ইতিবাচক সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে 'কিছু ঘটলেই আন্দোলন'—প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিষয়টি একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় না। আমার দৃষ্টিতে এটি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক—দুই দিকই বহন করে। একদিকে, জনগণের দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায় যে তারা সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন, নীরব নয় এবং নিজস্ব অধিকার নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। এটি গণতন্ত্রের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শক্তি। যে সমাজে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, সে সমাজ স্থবির হয়ে যায় না; বরং পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আন্দোলনই বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্ম দিয়েছে—এটি একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও বটে।

তবে অন্যদিকে, ঘন ঘন আন্দোলনের নেতিবাচক দিকও কম নয়। দ্রুততর উত্তেজনা, তথ্য যাচাই না করে প্রতিক্রিয়া, ছোট ইস্যুকে বড় করে দেখা এবং সামাজিকমাধ্যমে আবেগের অতিরিক্ত বিস্তার—এসব কারণে আন্দোলন কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষে রূপ নেয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সমস্যার সমাধানে আলোচনার জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। যখন আন্দোলনই প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়, তখন সংলাপ, আলোচনা বা প্রশাসনিক সমাধান প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর।

সুতরাং আন্দোলন হওয়া উচিত প্রয়োজনের মুহূর্তে, যুক্তি ও সংগঠনের ভিত্তিতে, এবং সমাধানমুখী লক্ষ্য নিয়ে। অযথা উত্তেজনা বা আবেগের খেয়ালে নয়। একইভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে—যেন কোনো সমস্যা আন্দোলনে রূপ নেয়ার আগেই সমাধান পাওয়া যায়।

অর্থাৎ এই প্রবণতা আমাদের সমাজের অসন্তোষ, প্রত্যাশা, আস্থাহীনতা ও সচেতনতার মিশ্র প্রতিফলন। তাই সমাধান ও বহুমাত্রিক হওয়া উচিত—দায়িত্বশীল নাগরিকতা, স্বচ্ছ প্রশাসন, সঠিক তথ্য এবং গঠনমূলক সংলাপ—এগুলোই পারে আন্দোলনের সংস্কৃতিকে সুষম ও ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে।

সমাজ যেন এক বিশাল সাগর—তার ঢেউ কখনও শান্ত, কখনও উত্তাল। বাংলাদেশ নামের এই সাগরে মানুষজনের আবেগও তেমনি ঢেউ তুলে বারবার তীরে আছড়ে পড়ে। একটু অন্যায়, সামান্য অবহেলা কিংবা ক্ষুদ্র কোনো অসঙ্গতি সবকিছুই কখনও কখনও উত্তাল জনমতের ঢেউ হয়ে ওঠে। এই প্রতিক্রিয়া নিছক আবেগ নয়; এটি ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রায় সঞ্চিত বেদনা, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস এবং পরিবর্তনের অদম্য আকাঙ্ক্ষার সম্মিলন।

তবু প্রশ্ন থাকে—প্রতিটি ঢেউ কি প্রয়োজনীয়? প্রতিটি আন্দোলন কি ন্যায়বিচারের শিখা জ্বালায়, নাকি কখনও আবেগের আগুনে যুক্তির প্রদীপ নিভে যায়? সমাজের প্রতিটি অস্থিরতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাধান শুধু রাস্তায় নয়; সমাধান অনেক বেশি গভীরে—বিশ্বাস, সংলাপ, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার ভেতর।

বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবাদী—এটাই তার শক্তি। কিন্তু সেই প্রতিবাদ যদি নির্মাণের পথ দেখায়, তবেই সেটি সার্থক। যদি আন্দোলন নতুন আলো জ্বালায়, নতুন পথ খুঁজে দেয় এবং সম্পর্কের ভাঙা সেতু মেরামত করে তাহলেই সমাজ এগোয়। এই প্রবণতার ভেতর লুকিয়ে আছে এক সত্য—মানুষ অন্যায়ের ভার বইতে চায় না। সে পরিবর্তন চায়, ন্যায়ের সন্ধান চায় এবং তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে যেতে দিতে চায় না। তাই প্রয়োজন এমন এক সমাজ, যেখানে কথা বলার জন্য রাস্তায় নামার প্রয়োজন কমে, আর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় যুক্তি ও সহমর্মিতার টেবিলে। এভাবেই আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ধীরে ধীরে পরিণত হতে পারে স্থির জলের গভীর প্রজ্ঞায়।

শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

শেয়ার বিজ

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অর্থনীতির ফসল অবিশ্বাস্য খেলাপি ঋণ

রেজাউল করিম খোকন

দেশে দেড় দশকের বেশি সময়ের অর্থনৈতিক চর্চাকে 'হাসিনোমিকস' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, 'অর্থনীতিতে 'ইকোনমিকস' শব্দ থাকলেও শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনে যা হয়েছে তা হলো 'হাসিনোমিকস'। ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে তা ফেরত না দিলেও চলবে— এটাই ছিল সেই সময়কার নীতি। ঋণ পরিশোধ না করেও নতুন ঋণ নেয়ার সুযোগ থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল শেখ হাসিনার আমলে।' ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশের অর্থনীতির বারোটা বেজেছে। বিশেষ করে ব্যাংক খাত তছনছ হয়েছে। ফলে এ খাতে স্বাভাবিক গতি আনতে পেরেশানিতে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। হাসিনার আমলে তার ঘনিষ্ঠ গুটিকয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্রের মদতে নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ ঋণ নিয়ে ব্যাংকব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সেই জের এখন তীব্রভাবে টানতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র উন্মোচিত হচ্ছে। বেরিয়ে আসছে প্রভিশন ঘাটতির পাশাপাশি তারল্য ঘাটতির চিত্রও। একে একে অর্থনীতির সব অসুখ প্রকাশ্যে আসছে বলে জানান তিনি। একসঙ্গে ওঠে আসা এত সব দুর্বলতা দেশের সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি। নীতি নির্ধারণে এখনও রয়েছে স্বচ্ছতার ঘাটতি। সার্বিক বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। আর বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি তো সর্বনিম্ন পর্যায়ে। কঠিন পদক্ষেপ না নিলে উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে দেশের অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি হবে। এতে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা সংকুচিত হতে পারে। কীভাবে এই খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা করা হবে, সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন তিনি। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে দেশের অর্থনীতি। দেশের ব্যাংকগুলো যত টাকা ঋণ দিয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশের বেশিই এখন খেলাপি। মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতের বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। যার ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ এখন খেলাপি। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ কম করে দেখানোর যে প্রবণতা ছিল, তা এখন হচ্ছে না। ফলে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র ওঠে আসছে। কিছুদিন পর বরং খেলাপি ঋণের হার আরও বাড়বে।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠিত হওয়ার সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের হিসাব করে থাকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থাৎ তিন মাস পরপর। গত জুন মাসে খেলাপি ঋণ ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। তিন মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ৩৬ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা। শেখ হাসিনার টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কম দেখানোর একটা অপপ্রয়াস ছিল। তথ্য বিকৃত করে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা আমরা দেখেছি। সঠিকভাবে হিসাব করায় সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের আসল চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে ব্যাংক খাতে অনিয়ম, জালিয়াতি, প্রতারণা ও দুর্নীতি এত বেশি মাত্রায় হয়েছে যে খেলাপি ঋণের এ উচ্চ হার সেই চিত্রেরই প্রমাণ দিচ্ছে। এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, হল-মার্ক গ্রুপসহ আরও গ্রুপ এবং বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারির কারণে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৪১ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১১ সালে খেলাপি ঋণের হার ৬ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এলেও বড় বড় কেলেঙ্কারির পরে তা বাড়তে থাকে। শেখ হাসিনার টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কম দেখানোর একটা অপপ্রয়াস ছিল। তথ্য বিকৃত করে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা আমরা দেখেছি। সঠিকভাবে হিসাব করায় সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি হার প্রায় ৩৬ শতাংশ হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিছুদিনের মধ্যে এ হার বরং ৪০ শতাংশও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আসলে প্রত্যেক ব্যাংকের শীর্ষ ১০ খেলাপির জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল করতে হবে। নইলে এ থেকে আমরা মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ও হার নির্ধারণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকাররা বলছেন, এ কারণেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ও হার বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ও হার নির্ধারণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ কারণেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ও হার বেড়েছে। খেলাপি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী, ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন থেকে সেই ঋণ বকেয়া হিসেবে বিবেচিত হবে। গত এপ্রিলের আগ পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯ মাস পর্যন্ত খেলাপি হিসেবে গণ্য করা হতো না। অর্থাৎ ৯ মাস শেষে গিয়ে খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন বকেয়া হওয়ার তিন মাস পরেই খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রভিশন ঘাটতিও ব্যাপক বাড়ছে। খেলাপি ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তাব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংক তাদের আয় থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিতি হিসেবে রাখে। কোনো কারণে ঋণ আদায় না হলেও গ্রাহকদের আমানতকে সুরক্ষা দেয়াই হচ্ছে এর অন্যতম কারণ। প্রভিশন ঘাটতি হচ্ছে ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সঞ্চিতি বা প্রভিশন রাখতে না পারা। সব ব্যাংকেই কম বেশি খেলাপি গ্রাহক আছে। তবে বিদেশি ব্যাংকে কম ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে বেশি। জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংকে খেলাপির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। তবে মোট খেলাপি বৃদ্ধিতে একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংকের দায় কম নয়। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক একীভূত হতে যাচ্ছে। এ পাঁচ ব্যাংকের প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে দেড় লাখ কোটি টাকা খেলাপি।

এক্সিম ব্যাংক ছাড়া বাকি চারটিই ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। তারা এসব ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিয়েছে, যা এখন খেলাপি। ঋণগুলো লুকানো ছিল। এখন প্রকাশ পেয়েছে। আসলে শরীরে যে এত রোগ ছিল তা জানা ছিলই না। রোগ জানার ফলে এখন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ঋণগুলো এত দিন ধরে লুকানো ছিল। এখন প্রকাশ পেয়েছে। এখন প্রশ্ন, রোগ নিরাময় করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে? পাঁচ ব্যাংক এক করা, কিছু ব্যাংকে প্রশাসক নিয়োগ করা এবং ব্যাংক কোম্পানি আইনকে পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ ছাড়া কিছুই করা হয়নি। এই সময়ে বিনিয়োগ এত যে খারাপ অবস্থায় আছে এবং ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসেছে, তাকে তেজি করার ক্ষেত্রে সুদের হারসহ অন্যান্য ব্যবস্থা তারা (সরকার) কি নিচ্ছে, তা হচ্ছে বড় বিষয়।

এখন বেনামি ঋণের আলোচনা করতে গিয়েই এর পেছনের বড় বড় মানুষগুলোকে আবিষ্কার করা হচ্ছে। টাকা পাচারের প্রতিবেদন থেকেই জানা যাচ্ছে পেছনের মানুষগুলো, তাদের রাজনৈতিক সংশ্লেষ এবং ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশগুলো। ব্যাংকগুলো বছরের পর বছর খেলাপি ঋণের তথ্য প্রকাশের পরিবর্তে বরং গোপন করেছে এবং তথ্য-উপাত্ত জালিয়াতি করে দেখিয়েছে মুনাফা।

এত অবিশ্বাস্য পরিমাণের খেলাপি ঋণের বিষয়টি আর কিছুই নয়, আগের সরকারের আমলের অনিয়ম-দুর্নীতির ফল। অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিয়েছে, খেলাপি ঋণের হিসাব হবে স্বচ্ছ এবং আগের মতো তথ্য-উপাত্তের জালিয়াতি আর করা যাবে না। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়লেও সত্য তথ্য ওঠে আসছে এটাই হচ্ছে ইতিবাচক দিক। বিগত সরকারের আমলে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে স্বজনতোষী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল ব্যাংক খাত। সরকার ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে দুর্নীতি, অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে যে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছিল, তার বড় একটা অংশ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে এই গোষ্ঠীর অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গেলেও আমাদের অর্থনীতি ও ব্যাংক খাতকে দীর্ঘমেয়াদি সংকটে ফেলে গেছে। ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ হওয়ার তথ্য সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, খেলাপি ঋণের হার ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। খেলাপি ঋণের সংকটকে বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। গত কয়েক দশকে একদিকে রাজনীতিতে ক্রমে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বেড়েছে, অন্যদিকে সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। বিগত সরকারগুলোর আমলে খেলাপি ঋণ আলোচনার একটি বড় কেন্দ্রবিন্দু থাকা সত্ত্বেও সরকারি নীতি বরং ঋণখেলাপিদের পক্ষে কাজ করেছে। বারবার ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণের যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাতে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে দেশে খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়। ২০১১ সালে খেলাপি ঋণের হার কমে ৬ দশমিক ১ হয়। এর পর থেকে এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, হল-মার্ক গ্রুপসহ সরকারঘনিষ্ঠ আরও অনেক গ্রুপের কেলেঙ্কারির কারণে খেলাপি ঋণের হার ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকার এসে খেলাপি ঋণের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক, কেননা এতে ব্যাংক খাতের প্রকৃত রুগ্ন চিত্র উঠে আসছে। খেলাপি ঋণের সঙ্গে ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশের সব ব্যাংকেই কমবেশি খেলাপি গ্রাহক থাকলেও বিদেশি ব্যাংকে কম, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে বেশি। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধিতে একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংকের দায়ও অনেকখানি। এর মধ্যে চারটি ব্যাংকই হাসিনা ঘনিষ্ঠ এস আলমের মালিকানাধীন এবং নামে-বেনামে এই গোষ্ঠী তাদের ব্যাংকগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নেয়, যা এখন খেলাপি।

বিগত সরকার কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার পেছনে ব্যাংক লোপাট করা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর দায় কোনো অংশে কম নয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে অন্তর্বর্তী সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপি ঋণের তথ্য প্রকাশের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, কিন্তু খেলাপি ঋণ আদায়ে এখন পর্যন্ত জোরালো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয় নেই। অথচ প্রয়োজনীয় সংস্কার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগ ছিল।

শীর্ষ ও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। প্রতিটি ব্যাংকের শীর্ষ খেলাপিদের বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই প্রস্তাবকে যথার্থ বলে মনে করি। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলেই আমরা আশা করি। আগামী নির্বাচনে জনগণের সমর্থন নিয়ে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবেন তাদের অবশ্যই অতীতের স্বৈরাচারী শাসনামলের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সৃষ্ট অবিশ্বাস্য পরিমাণের খেলাপি ঋণের বোঝা সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হবে। তবে আগামী সরকারকে বিদ্যমান খেলাপি ঋণের বোঝা কমিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুন করে যাতে আগের মতো ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, রাজনৈতিক প্রভাবের চাপে খেলাপি ঋণ বাড়তে না পারে, সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার
কলাম লেখক

CamScanner

We should not be made to fight climate change alone

Climate change continues to be the single greatest existential threat to people in the 21st century, yet this threat is compounded many times over for vulnerable nations such as ours.

To that end, Bangladesh's first steps toward developing a climate finance framework is encouraging and necessary. For some time now, it has been clear that we cannot wait passively for external aid and instead, we have had to design mechanisms that can mobilize domestic resources to fortify against the climate crisis.

Rising seas, intensifying cyclones, and unpredictable rainfall patterns -- this has been and will continue to be our reality, and have compelled us to innovate in financing adaptation and mitigation.

However, while we continue to do what we must, the fact remains that such a burden should never have rested solely on nations like ours in the Global South who were not responsible for the climate crisis to begin with.

The Global North, whose industrialization has driven the climate crisis, has pledged billions in climate finance but year after year fail to deliver on that promise. The gap between rhetoric and reality remains stark.

For countries such as ours, this shortfall means millions continue to be left exposed to disaster. Climate justice requires that wealthy nations honour their commitments, not as charity but as accountability.

Our emerging climate finance initiatives show our determination to build resilience. Sadly, this alone cannot bridge the gap between need and resources. If we are to believe those who preach global solidarity, then we must see actions that complement these lofty claims. The industrialized Global North must finally step up. Climate finance is not a favour but a moral and historical obligation.

For countries such as ours, this shortfall means millions continue to be left exposed to disaster

CamScanner

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক চালু আগামী সপ্তাহে

নিজস্ব প্রতিবেদক ❑

আগামী সপ্তাহ থেকে সমস্যাগ্রস্ত পাঁচ শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত হয়ে গঠিত হওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক চালু হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৫' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এসময় গভর্নর বলেন, ব্যাংক রেজ্যোলুশন অর্ডিন্যান্স পাঁচটি ব্যাংকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে একীভূত করে একটি নতুন ব্যাংক গঠন হবে। আমরা আশাবাদী আগামী সপ্তাহেই লঞ্চিং হয়ে যাবে। এতে ৩৫ হাজার কোটি টাকার পেইড-আপ ক্যাপিটাল থাকবে। আমরা পাঁচ দুর্বল ব্যাংক নিয়ে একটি সবল ব্যাংক গঠন করতে যাচ্ছি। এতে সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে। এরআগে গত ৯ নভেম্বর পাঁচ দুর্বল ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' নামে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠনের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রস্তাব এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে শরিয়াহভিত্তিক পাঁচটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। ব্যাংক পাঁচটি একীভূতকরণের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ৫ নভেম্বর ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের চিঠি দিয়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকগুলো হলো-

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক পিএলসি এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। এসব ব্যাংককে একীভূত করে একটি নতুন সরকারি মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ব্যাংকের নাম দেয়া হয় 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক'।

তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছিলেন, শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচটি ব্যাংকের বোর্ড বাতিল হলেও গ্রাহকসেবায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। ব্যাংকগুলোর পেমেন্ট, রেমিট্যান্স ও এলসিসহ সব ধরনের কার্যক্রম আগের মতোই চলবে। ৬ নভেম্বর গভর্নর বলেন, যদিও বোর্ড বাতিল, তবে ব্যাংকগুলোর দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ হবে না। আমাদের লক্ষ্য, ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখা এবং ধাপে ধাপে পাঁচ ব্যাংকের সম্পদ ও আইটি সিস্টেম একীভূত করা। তিনি বলেন, পাঁচটি ব্যাংকের মোট ৭৫০টি শাখা ও ৭৫ লাখ আমানতকারী রয়েছে। লিকুইডেশন এড়াতে তাদের স্বার্থে প্রথম ধাপেই কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত একীভূতকরণ শুরু করা হয়েছে।

গভর্নর বলেন, 'নন-ভায়েবল' বা টেকসই নয় বলে ঘোষিত পাঁচটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে প্রতিটিতে অস্থায়ী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক মিলেই হবে দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক। নতুন এ সমন্বিত ব্যাংকের পেইড-আপ ক্যাপিটাল হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা, যা বর্তমানে দেশের যেকোনো ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। গভর্নর বলেন, এটি সরকারি মালিকানাধীন হলেও বেসরকারি ব্যাংকের মতো পরিচালিত হবে। পেশাদার এমডি, বাজারভিত্তিক বেতন কাঠামো ও পৃথক শরিয়াহ্ বোর্ড গঠন করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামিক ব্যাংকিং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

CamScanner

COP-30 ends with hopes and despairs

SHAHRIAR HOSSAIN, PH.D.

COP-30 concluded in Belém with a sense of both achievement and unease. We could feel it in the hallways as negotiators packed their documents and rushed for flights. Some walked away with cautious satisfaction. Others looked drained, knowing the world cannot afford another year of slow political motion. The Amazon rains outside felt like a mirror of the week itself: heavy, unpredictable, sometimes cleansing, sometimes overwhelming.

What this really means is that COP-30 marked neither triumph nor collapse. Instead, it exposed the shifting shape of global climate politics - the points where momentum is growing, and the pressure points where it breaks down. To understand the implications for the world, and particularly for vulnerable nations like Bangladesh, we need to be honest about what was achieved, where we stumbled, and what the road ahead demands.

The real gains: adaptation, loss & damage, and the politics of implementation: Let's break this down. There were three areas where COP-30 delivered real, tangible movement.

First: adaptation finance finally received the political attention it has long deserved.: For years, adaptation has been treated like the quiet, dutiful sibling of mitigation - always important, rarely funded at scale. This COP changed that balance. Countries agreed on the political goal of tripling adaptation finance by 2035. It is not perfect. It is not guaranteed. But it represents a long-awaited shift in global climate priorities, particularly for low-income and climate-exposed nations.

This matters for Bangladesh. We are a nation that has done everything asked of us: we have invested in resilience, built early warning systems, strengthened community-based responses, and innovated in climate-smart agriculture. But no country can finance climate adaptation alone at the scale the science now demands. A political commitment to tripling adaptation finance finally gives our most urgent needs a seat at the main table.

Second: the Loss & Damage Fund took a decisive step from promise to reality: Last year, we celebrated the establishment of the Fund. But it was still an institution without legs. COP-30 gave it structure, guidance, and its first funding call - a signal to the world that frontline communities suffering irreversible impacts will no longer be left to fend for themselves.

Anyone who works with coastal farmers in Khulna or families displaced from river erosion in Kurigram understands what this means. Loss & Damage is not a theory. It is human life. It is land lost to salinity, livelihoods wiped out by floods that break all previous records, and communities forced into migration before they are ready or supported.

Is it enough? Not yet. But it marks the first operational step in what needs to become a global safety net for climate justice.

Third: Belém produced an emerging political narrative centered on implementation and people-centered climate action: Several declarations anchored a new theme: that climate action cannot be separated from jobs, forests, indigenous leadership, and practical pathways for countries to industrialise without repeating the mistakes of the past. The Brazilian hosts pushed this narrative hard, and it landed with surprising traction.

This new framing offers a bridge between climate ambition and the development needs of the Global South. It moves the conversation away from moral appeals alone, toward political coalitions grounded in opportunity and livelihoods. That shift could matter more than any single paragraph in the final text.

Most critically, COP-30 did not succeed in aligning global action with a 1.5°C trajectory. That is the measure history will use. And for now, we remain off-track.

What the Global South - and Bangladesh - should push for next. The path forward is clearer than many believe. First: make climate finance predictable and accessible. It is time to push for multi-year, legally grounded commitments that go beyond political goodwill. Bangladesh should strengthen its alliances with climate-vulnerable nations to demand guaranteed flows through multilateral funds, not fragmented bilateral projects.

Second: build our role in sectoral coalitions. Whether it is methane reduction, clean shipping in the Bay of Bengal, textile decarbonisation, or renewable energy corridors across South Asia, Bangladesh can position itself as a regional leader in practical climate cooperation.

Third: convert COP declarations into real pipelines. The bridges between global politics and national implementation must be strengthened. That means project preparation facilities, technical assistance hubs, and stronger national systems to absorb and deploy climate finance.

Fourth: keep climate justice at the center of global pressure. When small nations speak together, the message lands differently. Civil society, youth, and community leadership need to stay visible - not only for moral reasons, but because they shift political baselines in ways diplomats alone cannot.

COP-30 was not the turning point many hoped for. It advanced meaningful work on adaptation and loss & damage, and it articulated a promising narrative on people-centered implementation. These outcomes will matter. They will save lives and strengthen resilience.

But on the central challenge - cutting emissions quickly enough to preserve a livable future - the world remains trapped in political caution and structural delay. The absence of a fossil fuel phase-down roadmap is not a small detail. It is a warning.

Still, the summit did not leave us without hope. Instead, it showed that progress is now coming from multiple directions: from coalitions of countries that choose to move faster, from civil society that refuses to let justice be sidelined, and from the growing recognition that climate action must support - not undermine - human development.

Future COPs will be shaped by this new reality. And the nations most exposed to climate impacts must lead in defining what justice, ambition, and real implementation look like.

We cannot wait for the world's largest emitters to find perfect alignment. The work ahead belongs to all of us. And if COP-30 taught us anything, it is that the future of climate action will be written by those who refuse to accept slow progress as the limit of what is possible.

The writer is a contributor

CamScanner

কপ-৩০ : ব্রাজিলের জলবায়ু নীতি ও ন্যায়বিচারের নয়া সমীকরণ

আহমেদ মুনওয়ার মাহবুব

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জলবায়ু আলোচনা মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিশ্রুতিকেই কেন্দ্র করে থেকেছে। কিন্তু আসল এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রশ্ন—জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন কত দ্রুত এবং কীভাবে বন্ধ হবে—রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তা সবসময় এড়ানো হয়েছে। কপ২৮-এ প্রথমবার 'জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসা' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কিছু অগ্রগতি দেখা গেলেও তা ছিল ধীর এবং অসম। এ প্রেক্ষাপটে লুলা দা সিলভার স্পষ্ট অবস্থান স্থবিরতা কাটানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'পৃথিবী আর নিবিড়ভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সহ্য করতে পারে না,' এবং এর পর্যায়ক্রমিক অবসানের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপের দাবি তুলেছেন। বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ঐতিহাসিকভাবে বড় উৎপাদক দেশ ও জ্বালানি কোম্পানিগুলোই এই রূপান্তরের প্রধান বাধা হিসেবে পরিচিত। তবে প্রতিরোধের উৎস শুধু মুনাফাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান নয়; অনেক সরকারও সামাজিক ন্যায়বিচার ও দরকারি পরিষেবার অর্থায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ায় দ্রুত পর্যায়ক্রমিক বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রাজিল এ দোলাচলের স্পষ্ট উদাহরণ—একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিপুল সম্ভাবনাময়, অন্যদিকে গভীর দারিদ্র্য ও শক্তিশালী অফশোর তেল খাতসহ একটি জটিল অর্থনীতি। লুলার 'পরিকল্পিত ও ন্যায্য' জীবাশ্ম জ্বালানি অবসানের আহ্বান তাই বোঝায় যে সুশৃঙ্খল রূপান্তর উন্নয়নকে দুর্বল না করে বরং শক্তিশালী করতে পারে। এখন ব্রাজিলের সামনে চ্যালেঞ্জ—নিজস্ব শক্তি রূপান্তর পরিচালনা করা এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এই দ্বৈত ভারসাম্যের প্রতিফলন দেখা যায় লুলার প্রস্তাবিত জাতীয় তহবিলে, যেখানে তেলের রাজস্বের একটি অংশ সবুজ রূপান্তরে বিনিয়োগ করা হবে। এটি এমন এক কৌশল, যেখানে পুরোনো অর্থনীতির আয়কে নতুন অর্থনীতির ভিত্তি গঠনে ব্যবহার করা হবে—এবং তা শ্রমিক বা দুর্বল জনগোষ্ঠীর ক্ষতি না করেই। বিশ্বে এমন উদাহরণ আগেও দেখা গেছে। নরওয়ের সার্বভৌম তহবিল তেলের রাজস্বকে দীর্ঘদিন ধরে কম-কার্বন খাতে বিনিয়োগে ব্যবহার করছে এবং আমাজন ফান্ডকেও সহায়তা দিচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্ব তিমুরও পেট্রোলিয়ামভিত্তিক আয় ব্যবহার করে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য গড়ে তুলছে। জলবায়ু আন্দোলনকারীরা দীর্ঘদিন ধরে ধারণা করেছিলেন যে তেলের অর্থ নিয়ে আলোচনা করলে নিষ্কাশন কার্যক্রম বৈধতা পাবে, কিন্তু এ এড়িয়ে চলা সম্পদনির্ভর দেশগুলোকে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন পর্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবাশ্ম জ্বালানি রাজস্বকে সুপরিচালিত তহবিলের মাধ্যমে সবুজ রূপান্তরে ব্যবহার করাই যৌক্তিক পথ। মাত্র দশ বছর আগেও জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত ভবিষ্যৎ কল্পনা করা কঠিন ছিল। কিন্তু এখন অর্থনৈতিক বাস্তবতা বদলে গেছে—নবায়নযোগ্য জ্বালানি আরও সাশ্রয়ী এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি পরিপক্ব হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো শক্তি রূপান্তরকে উৎপাদনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব বৃদ্ধির সুযোগ হিসেবে দেখছে। ব্রাজিলের অভিজ্ঞতাও এই প্রবণতাকে সমর্থন করে। দেশটি দীর্ঘদিন তেলের ভাড়ার ওপর সামাজিক কর্মসূচি ও অবকাঠামোর জন্য নির্ভর করলেও এখন তা জৈব জ্বালানি, টেকসই বিমান জ্বালানি এবং বৃহত্তর নবায়নযোগ্য ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিহাসে নিষ্কাশন শিল্পনির্ভর এলাকাগুলোতেও নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, যা দেখায় যে রূপান্তর উন্নয়ন এজেন্ডাকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং আরও দৃঢ় করতে পারে।

তবে বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ার ঝুঁকি ব্রাজিলের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি গভীর জলের ড্রিলিংয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। কপ৩০-এর কয়েক সপ্তাহ আগে পেট্রোব্রাসকে আমাজন নদীর মোহনায় ড্রিলিং লাইসেন্স দেওয়া হয়—যেটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। জ্বালানি নিরাপত্তার যুক্তিতে কিছু কর্মকর্তা এটি সমর্থন করলেও পরিবেশবাদীরা বলছেন, এটি ব্রাজিলের জলবায়ু নেতৃত্বকে দুর্বল করে। এ ধরনের উত্তেজনা এড়ানো যেত একটি স্পষ্ট ও সুগঠিত রূপান্তর পরিকল্পনার মাধ্যমে, যা অ্যাড-হক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে না। কপ৩০-এ নেতৃত্ব শক্তিশালী করতে চাইলে ব্রাজিলের নতুন ট্রানজিশন ফান্ডকে প্রতীকী রাখলে চলবে না; রাজস্ব বণ্টনকে স্বচ্ছ করতে হবে, শাসন কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে এবং নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে। পরিকল্পনাটিকে দেশের পরিবেশগত রূপান্তর কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করলে নবায়নযোগ্য শক্তি, সবুজ শিল্প, টেকসই অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতে বিনিয়োগ আরও কার্যকর হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্রাজিলের কপ৩০ সভাপতিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য একটি সহযোগী কাঠামো তৈরি করা। কোস্টারিকা ও ডেনমার্কের উদ্যোগে গঠিত 'বিয়ন্ড অয়েল অ্যান্ড গ্যাস অ্যালায়েন্স' সরবরাহ পক্ষের পদক্ষেপ উৎসাহিত করলেও বড় উৎপাদকরা এতে যোগ দেয়নি। ব্রাজিল এই দূরত্ব কমাতে পারে—উৎপাদক দেশগুলোকে একটি নমনীয় ও সুশৃঙ্খল নির্দেশিকা তৈরিতে উৎসাহিত করে। আলোচনায় এমন মানদণ্ড তৈরি হওয়া প্রয়োজন, যা প্রতিটি দেশের সক্ষমতা ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব অনুযায়ী বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি নতুন আমলাতন্ত্র তৈরি না করে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে কার্যকর প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করাকে জলবায়ু আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা। এতে প্রমাণ হবে যে বহুপাক্ষিকতা এখনো কার্যকর, দেশগুলো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়েও সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম, জীবাশ্ম জ্বালানিকে আর 'অস্পৃশ্য' মনে করা হচ্ছে না এবং উৎপাদক দেশগুলোও সহযোগী কাঠামোর অংশ হতে আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সবুজ রূপান্তরের সফলতা নির্ভর করে জীবাশ্ম জ্বালানি রাজস্বের প্রশ্নটি সরাসরি মোকাবিলা করার ওপর। তা না হলে জলবায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে না। ব্রাজিল কপ৩০-এ এই বিতর্ক উত্থাপন করে এবং রূপান্তরকে পরিবেশগত জরুরি অবস্থা নয়, বরং একটি আর্থ-সামাজিক সুযোগ হিসেবে উপস্থাপন করে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ হলো এ নতুন আলোচনা যেন দেশীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি সুসংহত, বাস্তবসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রূপ পায়।

লেখক : সাংবাদিক

CamScanner

ট্রাম্পের অ্যান্টি-কার্টেল অভিযান নাকি ভূরাজনীতি?

আমেরিকা এমন এক সংঘাতে পা দিয়ে ফেলেছে, যা প্রকাশ্যে আনতে কিছুটা দ্বিধায় ছিল। কিন্তু লক্ষণগুলো সামান্য নয়, বরং প্রকট-সংবাদ শিরোনাম, পেন্টাগনের বিবৃতি, স্যাটেলাইট ছবি আর ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের অবস্থান বদলের গর্জন সব একই সূত্রে গাথা। যদি এটাকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা না হয়, তবে 'যুদ্ধ' শব্দটির আর কোনো অর্থই থাকে না

এম এ হোসাইন
রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

মাদকবিরোধী অভিযানের নামে চালানো হলেও প্রকৃত চালিকাশক্তি হচ্ছে ভূরাজনীতি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়–মহাশক্তিগুলো দুর্বল রাষ্ট্রের সঙ্গে হঠাৎ করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে না। তাদের পদক্ষেপ থাকে লক্ষ্যভেদী, যদিও সেই লক্ষ্য প্রায়ই আড়াল করা হয়। আর ইতিহাস এটাও বলে একজন স্বৈরশাসককে সরানো সহজ, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন রাষ্ট্র গড়া কঠিন। মার্কিন নীতিনির্ধারকরা হয়তো প্রথম কাজটা শিগগিরই করে ফেলবে, কিন্তু দ্বিতীয় কাজটির জন্য প্রস্তুত আছে এমন কোনো ইঙ্গিত এখনও দেখা যাচ্ছে না

আমেরিকা এমন এক সংঘাতে পা দিয়ে ফেলেছে, যা প্রকাশ্যে আনতে কিছুটা দ্বিধায় ছিল। কিন্তু লক্ষণগুলো সামান্য নয়, বরং প্রকট-সংবাদ শিরোনাম, পেন্টাগনের বিবৃতি, স্যাটেলাইট ছবি আর ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের অবস্থান বদলের গর্জন সব একই সূত্রে গাথা। যদি এটাকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা না হয়, তবে 'যুদ্ধ' শব্দটির আর কোনো অর্থই থাকে না।

এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় নীরবে। ক্যারিবিয়ান সাগরের কোথাও ঢেউয়ে ভাসমান কাঠের ছোট নৌকাকে লক্ষ্য করে একটি ড্রোনের আঘাতের মধ্য দিয়ে। এ ধরনের নৌকা এই অঞ্চলে খুবই স্বাভাবিক যা মূলত মৎস্যজীবী, চোরাকারবারি কিংবা যে কেউ ব্যবহার করে যাদের কাছে ওই উপকূলের জ্ঞান সরকারি মানচিত্রের চেয়েও বেশি আছে। সাধারণত মার্কিন বাহিনী এগুলো আটক করে তল্লাশি চালায়। কিন্তু এবার ড্রোন হামলায় এগুলোকে সোজা পানিতে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটির পর আরেকটির ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কয়েক সপ্তাহে মধ্যে প্রায় ১৪টি হামলা পরিচালনা করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন বিবৃতিতে বলেছে, তাদের লক্ষ্য ছিল মাদকচোরাচালানিদের নৌকা। কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। কারণ কোকেন চোরাচালানের প্রধান রুট এসব জলসীমা নয়। বরং কলম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়া, মেক্সিকো হয়ে স্থলপথ বা প্রশান্ত মহাসাগরের পথে মাদক চোরাচালান হয়ে থাকে। ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে যাকে 'মাদকবিরোধী' অভিযান হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, সেটাই ছিল আসলে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে নতুন কৌশলগত অবস্থান নেওয়ার সূচনা–যার কেন্দ্রবিন্দু হলো ভেনেজুয়েলা।

অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের এই মুখোশ পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে যায়। আমেরিকার অত্যাধুনিক বিমানবাহী রণতরীকে এই অঞ্চলে অবস্থান নিতে দেখা যায় এবং নীরবে সিআইএকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে গুপ্ত কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। কূটনীতির ভাষায় এটি ছিল ঝড়ের আগে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে চাবি লাগানোর মতো পদক্ষেপ। বার্তাটি ছিল সুস্পষ্ট-পরবর্তী ড্রোন হামলা হয়তো আর কাঠের নৌকায় হবে না; কোনো পতাকাকেই লক্ষ্যবস্তু করা হবে।

কিন্তু কেন ভেনেজুয়েলা? উত্তরটি দীর্ঘও, আবার সরলও। দীর্ঘ উত্তরে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণিত তেলভান্ডারের মালিকানা এবং সেই সম্পদকে নিরাপত্তার বিনিময়ে মস্কোর কাছে তুলে দেওয়া। আছে চীনের দেওয়া বিপুল অবকাঠামো ঋণ, যা কারাকাসের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। আছে রাশিয়ার বোমারু বিমান ভেনেজুয়েলার ঘাঁটিতে অবতরণ, আর মার্কিন প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও মাদুরোর আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে তেলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

আর সরল উত্তরে আছে ক্ষমতার প্রশ্ন। ট্রাম্প প্রশাসন বহু মেরুবিশ্ব মেনে নিলেও পশ্চিম গোলার্ধে বহু মেরুতা মেনে নেওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই। মোনরো ডকট্রিন, যা অনেকের চোখে মৃত কূটনৈতিক নীতি, তা আবার নতুন প্রাণ পেয়েছে ওয়াশিংটনের কৌশলগত ভাবনায়। আর ভেনেজুয়েলা যা অর্থনৈতিক, বিচ্ছিন্নতা ও রাজনৈতিকভাবে বিষাক্ততার পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছে। আমেরিকার প্রভাবমণ্ডলে থাকা কোনো রাষ্ট্র যখন মস্কো ও বেইজিংয়ের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ে, তখন কী হয়–এই প্রশ্নের জবাব দিতে ট্রাম্প আগ্রহী বলেই মনে হচ্ছে।

কূটনৈতিক ব্যাখ্যানেল যদি কখনো সত্যিই চলমান থেকেও থাকে, অক্টোবরের মধ্যভাগে তা ভেঙে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ডের প্রধান দুই বছর আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। মূলত এটা আক্রমণাত্মক অবস্থান নেওয়ার জন্য অন্য কাউকে সামনে আনার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটেছিল। এরপর এলো পেশিশক্তি–ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ১০ হাজারেরও বেশি মেরিন ও নৌসেনা, সঙ্গে এমন নৌ ও বিমানবহর যা কোনো 'মাদকবিরোধী' অভিযানের সঙ্গে মোটেও খাপখায় না। মাদক কারবারি দমন অভিযানে এফ-৩৫, বি-৫২ কিংবা জেরাল্ড আর. ফোর্ড ক্যারিয়ার গ্রুপের দরকার হয় না।

গোপন অভিযানের কথাও প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। কারাকাস অভিযোগ করছে, তারা সিআইএ-সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের আটক করেছে, যারা নাকি একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে ভুয়া হামলা সাজিয়ে যুদ্ধের অজুহাত তৈরি করতে চাইছিল। আরেক ঘটনায়, এফবিআই নাকি মাদুরোর ব্যক্তিগত পাইলটকে ঘুষ দিয়ে বিমানের রুট বদলে দিতে চেয়েছিল, যেন আকাশ থেকে মাদুরোকে ধরে ফেলা যায় এবং তার মাথার ওপর ঘোষিত ৫ কোটি ডলারের পুরস্কার দাবি করা যায়। শুনলে সিনেমার কাহিনির মতো লাগে, কিন্তু লাতিন আমেরিকায় ঠান্ডা যুদ্ধকালে মার্কিন অপারেশনের ইতিহাস জানলে ঘটনাগুলোকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হবে না।

এখন প্রশ্ন–এরপর কী? গোপন অভিযান জটিলায় পড়লে সাধারণত সামনে আসে প্রকাশ্য অভিযান। হয়তোবা কিছু দিনের মধ্যেই ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় আক্রমণের অনুমোদন দিয়ে দেবেন। আমেরিকা ক্যারিবিয়ান সাগরে ১৯৬২ সালের কিউবা মিসাইল সংকটের পর সবচেয়ে বড় সামরিক সমাবেশ ঘটিয়েছে। পুয়ের্তো রিকো ও ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের পুরোনো সামরিক অবকাঠামো নতুনভাবে সক্রিয় করা হচ্ছে। রিপার ড্রোনগুলো টারমাকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নতুন শেল্টার ও রানওয়ে যেন দীর্ঘমেয়াদি অভিযানের জন্য প্রস্তুত। এগুলো সেই আয়োজন, যা কোনো সুপার পাওয়ার যুদ্ধ শুরুর আগে করে থাকে।

আর লক্ষ্য? ভেনেজুয়েলা সামরিক দৃষ্টিকোণে একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্র। কাগজে-কলমে বাহিনী বিশাল, কিন্তু বাস্তবে ভেঙে পড়ার উপক্রম প্রায়। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা তাদের রুশ এসইউ-৩০ বিমানগুলোকে অকেজো করে রেখেছে। পুরোনো এফ-১৬ দীর্ঘদিন উড়তে পারে না। সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় অচল। টিভিভিত্তিক কুচকাওয়াজের বাহিনী আর বাস্তবে যুদ্ধে বাহিনীর কোনো সাদৃশ্য রাখে না।

মস্কো কিছু প্রতীকী সমর্থন দিয়েছে। কিছু পরিবহন বিমান, উপদেষ্টা, কয়েকজন ওয়াগনার ভাড়াটে সৈন্য। কিন্তু এগুলো আমেরিকার নৌক্ষমতার সামনে তুচ্ছ। আর ইউক্রেনে জড়িত রাশিয়া ভেনেজুয়েলায় বড়সড়ো সম্পদ পাঠাবে, এমন আশা করাও অবাস্তব। চাইলে আমেরিকা ভেনেজুয়েলার সামরিক অবকাঠামো কয়েক দিনের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু এখানেই প্রকৃত বাস্তবতা এসে উন্মোচিত হয়। মাদুরোকে সরানো শেষ অধ্যায় নয়, বরং পরবর্তী অরাজকতার সূচনা মাত্র। শেভেজ দীর্ঘসময় ধরে বেসামরিক মিলিশিয়াদের হাতে লাখ লাখ একে-৪৭ বিতরণ করেছেন। অনুমান করা হয়, অর্ধমিলিয়নের মতো রাইফেল ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গ্যাং, লয়্যালিস্ট গ্রুপ, পাড়ার মিলিশিয়া আর সশস্ত্র বাহিনীর ভগ্নাংশের কাছে। শাসন বদল হলে এসব অস্ত্র অদৃশ্য হবে না, বরং নতুন আনুগত্যে, নতুন নেতার অধীনে নতুন বিভাজনে সংগঠিত হবে। দেশের ভেতর দ্রুত তৈরি হবে লিবিয়া বা সিরিয়ার মতো আরও বড় মানবিক বিপর্যয়।

আর এখানেই এই সংকটের সবচেয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নটি উঠে আসে–সম্ভবত আমেরিকা ইতিমধ্যে এমন একটি যুদ্ধেই জড়িয়ে গেছে, যার অস্তিত্ব স্বয়ং ওয়াশিংটন স্বীকার করতে চাইছে না। এটি ড্রোন, নৌবহর, গোপন অপারেশন ও কৌশলগত চাপ দিয়ে গঠিত এক আধুনিক যুদ্ধ। মাদকবিরোধী অভিযানের নামে চালানো হলেও প্রকৃত চালিকাশক্তি হচ্ছে ভূমাজনীতি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়–মহাশক্তিগুলো দুর্বল রাষ্ট্রের সঙ্গে হঠাৎ করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে না। তাদের পদক্ষেপ থাকে লক্ষ্যভেদী, যদিও সেই লক্ষ্য প্রায়ই আড়াল করা হয়। আর ইতিহাস এটাও বলে একজন স্বৈরশাসককে সরানো সহজ, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন রাষ্ট্র গড়া কঠিন। মার্কিন নীতি-নির্ধারকরা হয়তো প্রথম কাজটা শিগগিরই করে ফেলবে, কিন্তু দ্বিতীয় কাজটির জন্য প্রস্তুত আছে এমন কোনো ইঙ্গিত এখনও দেখা যাচ্ছে না।

CamScanner

মুক্তমত ■ তামান্না ইসলাম

জলবায়ু পরিবর্তনে শহুরে বস্তিবাসীর ঝুঁকি বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের পৃথিবী আজ এক বিরাট সংকটের মুখে। ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, অপ্রত্যাশিত বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং অসহনীয় গরম-এসবই জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ দিক। কিন্তু এই পরিবর্তনের ধাক্কা সমাজের সব স্তরের মানুষের উপর সমানভাবে পড়ে না। সবচেয়ে বেশি এবং ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষগুলো।

শহরের বস্তিগুলো সাধারণত গড়ে ওঠে নদীর পাড়ে, নিচু জমিতে, রেললাইনের পাশে বা এমন জায়গায় যেখানে সাধারণত কেউ থাকতে চায় না। এসব জায়গা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বস্তির ঘরগুলো তৈরি হয় টিন, পলিথিন, বাঁশ, কাঠ দিয়ে। এগুলো খুবই দুর্বল এবং ঝড়, বৃষ্টি বা তাপে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তিতে নর্দমা ব্যবস্থা ঠিকমতো নেই, তাই সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। এই জলবদ্ধতা দিনের পর দিন থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে, আবার কোথাও খরাও দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে এবং ঝড় আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। এসব পরিবর্তন সবার জন্যই সমস্যা, কিন্তু বস্তিবাসীদের জন্য এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

জলবায়ু পরিবর্তন-যা সচরাচর গ্রামে বা উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য বিপদ হিসেবে ভাবা হয়, প্রকৃতপক্ষে শহরের দরিদ্র, বস্তিবাসী মানুষের জন্য একটি মারাত্মক, বাড়তি ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ, আর্থিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি - সব মিলিয়ে তাদের জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ অস্থির হয়ে পড়েছে

প্রতিদিনের সংবাদ

অতিরিক্ত গরমের সময় টিনের ঘরগুলো চুলার মতো গরম হয়ে যায়। বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় বা নিয়মিত বিদ্যুৎ না পাওয়ায় পাখা চালানো সম্ভব হয় না। এই অতিরিক্ত গরমে বয়স্ক মানুষ এবং ছোট শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকে হিট স্ট্রোকেও আক্রান্ত হন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গেছে। হঠাৎ করে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি আকস্মিক বন্যা। বস্তিগুলো যেহেতু নিচু এলাকায় অবস্থিত, তাই এই বৃষ্টির পানি সব জমা হয় বস্তিতেই। ঘরের ভেতরে পানি ঢুকে যায়, রান্নাবান্না করা যায় না, ঘুমানোর জায়গা থাকে না। সামান্য যেটুকু সম্পদ আছে, তাও পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। জলবদ্ধ পানিতে নানা ধরনের রোগজীবাণু মিশে থাকে। বস্তিতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকায় এই দূষিত পানিই ব্যবহার করতে হয়। ফলে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মশার বংশবৃদ্ধি হয় দ্রুত, যার ফলে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ বাড়ে। বিশেষ করে শিশুরা এসব রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

বস্তিবাসীদের বেশিরভাগই দিনমজুর, রিকশাচালক, গৃহকর্মী, ফেরিওয়ালা বা এ ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের আয় নির্ভর করে প্রতিদিন কাজ করার ওপর। অতিরিক্ত গরমে বা বৃষ্টিতে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে কাজে যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজ না করতে পারলে আয় বন্ধ হয়ে যায়, তখন খাওয়াদাওয়ার সংকট দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক গ্রামীণ মানুষ কৃষিকাজ করতে না পেরে শহরে চলে আসছে। এতে বস্তিতে মানুষের চাপ বাড়ছে, বাসস্থানের সংকট তীব্র হচ্ছে। যার ফলে কাজের প্রতিযোগিতা বেশি হওয়ায় মজুরিও কমে যাচ্ছে।

বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়ার টাকা থাকে না। সরকারি হাসপাতালে লম্বা লাইন, ওষুধের অভাব এবং দূরত্বের কারণে অনেকে চিকিৎসা নিতে পারে না। ছোট অসুখ বড় হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। গর্ভবতী মা এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। বস্তির শিশুরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ভুগছে। অপুষ্টি, নানা রোগ এবং পড়াশোনার সুযোগ কমে যাওয়া তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিচ্ছে। বস্তির নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। পানি সংগ্রহ, রান্নাবান্না এবং পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত তাদের ওপরেই থাকে। জলবদ্ধতার সময় দূর থেকে নিরাপদ পানি আনতে হয়, যা খুবই কষ্টসাধ্য। বস্তিতে শৌচাগারের অভাব থাকায় নারীদের জন্য বিশেষ সমস্যা হয়, বিশেষত বন্যার সময়। গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মায়েরা পুষ্টিহীনতায় ভোগেন এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন। এই সমস্যা সমাধানে সরকার, এনজিও এবং সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বস্তিতে পাকা ঘর তৈরি, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন উন্নত করা প্রয়োজন। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। বস্তিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি সাহায্য, খাবার এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বস্তিবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যাতে তারা দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি নিতে পারে। বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা, যাতে দুর্যোগের সময়েও তাদের আয়ের উৎস থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন -যা সচরাচর গ্রামে বা উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য বিপদ হিসেবে ভাবা হয়, প্রকৃতপক্ষে শহরের দরিদ্র, বস্তিবাসী মানুষের জন্য একটি মারাত্মক, বাড়তি ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ, আর্থিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি -সব মিলিয়ে তাদের জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ অস্থির হয়ে পড়েছে। একটি মানবিক ও টেকসই সমাজ গড়তে হলে এই অসহায় মানুষগুলোর কথা ভাবতে হবে। তাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

লেখক : শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
tamannatushi1000@gmail.com

CamScanner

A Strategic Pause: Why Bangladesh Should Embrace a Six-Year Delay in LDC Graduation

Imran Hossain

Bangladesh stands at an economic crossroads. Having triumphantly met the United Nations' criteria for graduation from the Least Developed Country (LDC) category, the nation is officially scheduled to shed its status in November 2026. This milestone, a testament to decades of growth, is a source of national pride. However, a growing chorus of economists, global trade bodies, and industry leaders, as well as the private sector, is urging a strategic recalibration. In the face of mounting global headwinds, proactively seeking a six-year deferral of graduation until 2032 is not an admission of failure, but a prudent strategy for securing long-term, sustainable growth. While the government maintains its commitment to the 2026 timeline, recent analyses suggest that the economic landscape has shifted dramatically since the initial eligibility was confirmed. The confluence of post-pandemic supply chain realignments, persistent global inflation, and a weaker-than-expected recovery in key Western markets has created a perilous environment for losing the vital international support systems tied to LDC status.

The High Stakes of Graduation: Losing the International Safety Net

The core of the argument for a delay lies in the stark reality of what is lost upon graduation. LDC graduation is not merely a level; it is crucial international support. Recent reports support the argument for a delay. The World Bank's report, Bangladesh Development Update - January 2025, stresses the growing pressure on foreign exchange reserves and an unviable export forecast. Likewise, the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) expressed concern in its "Trade and Development Report Update, April 2024" about "fragile and uneven" global growth, particularly among developing countries' transformation.

Against this backdrop, the removal of privileges explicitly for LDCs seems extremely daunting:

The Erosion of Trade Preferences: The Ready-Made Garment (RMG) industry would be the most immediately affected. The transition from the EU's "Everything But Arms" (EBA) initiative to the conventional GSP might reduce export competitiveness by 8–10% annually due to tariffs, according to late-2024 research by the Centre for Policy Dialogue (CPD). A 2025 policy brief from the Research and Policy Integration for Development (RAPID) think tank highlights that Bangladesh is not yet

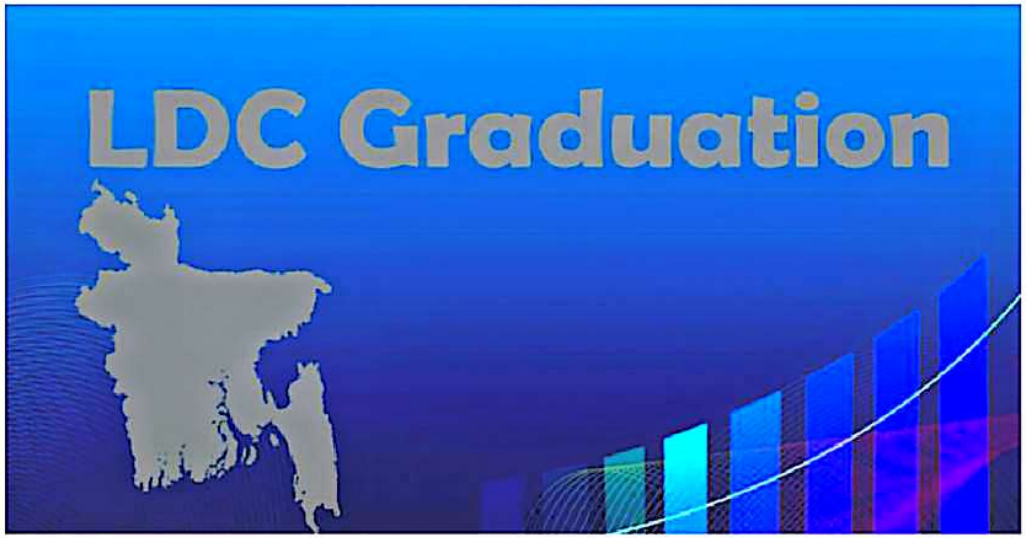

fully compliant with the 27 international conventions it is required to adhere to, a process that will necessitate several more years of legislative and institutional reform, despite the new EU GSP+ scheme offering a potential pathway.

The Squeeze on Development Finance: The loss of concessional financing is no longer a future threat but a present concern. The International Monetary Fund (IMF), in its 2024 Article IV Consultation, noted that Bangladesh's debt servicing costs are rising. Graduation will likely accelerate this trend, as it will cut off access to soft loans from bodies like the World Bank's International Development Association (IDA). For a nation acutely vulnerable to climate change and with massive infrastructure needs like the Padma Bridge and metro rail projects, this shift could severely strain foreign exchange reserves and escalate public debt.

The Strategic Pause: A Blueprint for 2032

A six-year deferral, from 2026 to 2032, is not an extended farewell party, but a designated "Strategic Consolidation Period". It is a meticulously planned transition period to build a shock-proof economy.

Economic restructuring and a diversification sprint: The fundamental purpose of this pause is to aggressively diversify the export basket. Bangladesh's greatest economic risk comes from its reliance on a single sector. A six-year window provides a realistic timescale to implement the essential labor, human rights and governance reforms to smoothly transition into the Eu's GSP+ system, avoiding the worst of the trade shock with fostering non-RMG exports, with targeted incentives for sectors such as pharmaceuticals, leather goods, agro-processing, and IT services as per the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) 2025 Outlook. Expand into new markets by negotiating Free Trade Agreements (FTAs) with Asian and African nations to compensate for European market losses. To increase competitiveness, implement broad changes to improve the ease of doing business, cut bureaucratic red tape, and invest in transportation and port infrastructure to minimize production lead times.

Strengthening Fiscal Resilience: The grace period should be used to significantly increase domestic revenue mobilization. The National Board of Revenue (NBR) has been fighting to increase the tax-to-GDP ratio, which is currently under 8% and one of the lowest in the world. A designated transition period increases political pressure to adopt the deep structural tax reforms urged by multilateral institutions. A concerted effort to broaden the tax base, modernize collection mechanisms, and combat illicit money flows is required to minimize reliance on foreign borrowing and establish a self-sustaining fiscal base to fund economic development.

A Climate Resilience Buffer: This period is significant for accessing and deploying LDC-specific climate funds to build long-term adaptation infrastructure. By channeling these resources into coastal embankments, saline-resistant agriculture, and renewable energy projects, Bangladesh can use its LDC status one last time to build defences against the climate shocks that will continue to threaten its economy long after graduation.

Feasibility and the Path Forward

The geopolitical and economic disruptions of recent years provide a compelling justification for a deferral. The UN's own framework acknowledges that exceptional circumstances, such as widespread global economic deterioration, can be considered. The government must shift its narrative. Instead of viewing a deferral as a failure, it should be framed as a "Strategic Consolidation Period" or a "Final Ascent Plan." This proactive diplomacy, highlighting the nation's vulnerability to external shocks and its commitment to a smooth transition, would likely find a sympathetic audience among international partners in the EU and UN who have a vested interest in Bangladesh's stable and sustained growth.

The pride associated with LDC graduation is undeniable. However, true leadership involves navigating complex realities with strategic foresight. The data from 2024 and the projections for 2025 paint a clear picture: the global economy is no longer as favorable as it was when the graduation journey began. To graduate into a crisis is to risk the hard-won gains of the past two decades. A strategic six-year pause is an investment in stability. It is the time needed to diversify exports, shore up public finances, and lock in climate resilience. By choosing a managed and prepared transition over a rushed exit, Bangladesh can ensure that its graduation is not just a ceremonial milestone, but a launchpad into secure and sustainable upper-middle-income status. The goal has always been to thrive, not just to graduate.

Imran Hossain teaches Business Administration in Bangladesh Army International University of Science and Technology (BAIUST), Cumilla.

CamScanner

Safeguarding Ecology While Widening Industries Is Too Big An Obligation

Rifat Rafique Badhan

A few years a Bangladeshi factory Green Textile Limited located in Bhaluka, Mymensingh has been recognized as the number one or top eco-friendly factory in the world. According to media report, the US Green Building Council (USGBC) has been recognized quality certificate as an environmentally friendly factory. Last February 21, the USGBC issued the prestigious certificate and the factory received 104 out of 110 marks in various criteria for environmentally friendly factories. More glorious news is that according to the latest USGBC list, 8 of the world's top 10 eco-friendly factories are in Bangladesh and the remaining two are in Indonesia and Sri Lanka. As of 2018, Indonesia had the world's most environmentally friendly factory. The factory then got 101 out of 110 marks. Moreover, 52 out of the top 100 environmentally friendly factories in the world are in Bangladesh and 10 factories in China are in the second position. Then Pakistan has 9 factories, Sri Lanka and India have 6 each with 12 and Vietnam and Taiwan have 4 and 8 factories each.

Currently, the importance, popularity and necessity of green factories or industry in the world is increasing at an appreciable rate due global brand. According to BGMEA, our country has 183 certified green factories as of December 2022, the highest compared to other countries, and another 500 factories are in the pipeline to be certified soon. Out of 183 garment and textile factories in Bangladesh, 60 have got Lead Platinum, 109 Gold, 10 Silver and 4 certified. Last year, a total of 27 companies in the ready-made garments and textiles sector received the certificate of eco-friendly factories.

Generally, green factories are built in compliance with all relevant international standards. Energy and water conservation, construction in compliance with building codes and proper waste management are given utmost importance while setting up such factories. It is important to keep solar power source, light with sensor, bicycle stand for energy saving, rainwater harvesting, water recycling systems, taps with sensors to reduce water wastage and modern sanitary fittings are essential to save water. Not only this, a green factory has to maintain indoor air quality as per ASHRAE standards. Besides, the temperature inside the factory is controlled to a tolerable level, which plays a role in maintaining the good health and productivity of a worker.

The primary foundation of a green factory is efficient and sustainable production, which balances environmental and business interests. All USGBC guidelines are preferred while setting up green factories. A factory is required to receive certification from the USGBC by achieving minimum standards in six specific areas prescribed by the USGBC to become Lead Certified. These include sustainable sites, efficient water management and electricity use, improved working environment, etc. If an industry or factory passes this standard then the factory gets the lead certificate based on the given marks. For example, when a factory building gets 80 or more points, it is certified as a Lead Platinum building in UG, similarly 70 or more is certified as Gold and 60 or more as Silver. Sustainable design is the key to green factories. In this process, maximum production is ensured in a fair working environment by utilizing natural resources in a cost-effective manner. The establishment is evaluated on a total of 110 points in various categories.

The reality is that setting up or renovating a green factory is very expensive. Advanced technology materials are used to make it. For example VOC Free Point, RUG Certified, FSC Certified, ASHRAE, Energy Star etc. international standard products are to be used. As a result, setting up a green factory costs at least 20-30 percent more than a normal factory. But since setting up a green factory is part of a long-term plan, the investment in this case is profitable in all respects and is quite important for international reputation and reputation. So we should make the policy of green finance easier. However, the USGBC's Green Factory policy places great importance on the working environment of the workers and thereby makes the working environment more pleasant for the workers. Workers also feel comfortable working in green infrastructure due to adequate light and ventilation, advanced machinery and modern facilities.

In our country mainly after the Tazreen Garments fire and the Rana Plaza collapse, foreign buyers started canceling purchase orders one after another. They even pressured the closure of the country's garment factories by alleging non-compliance. Accord and Alliance, a coalition of European and American buyers, visited the garment factories of Bangladesh at various times, creating fear among the entrepreneurs and causing great discomfort among the entrepreneurs. Later on, due to the constructive initiatives taken by the industrial owners, the uncertain situation has gradually been removed and a very favorable situation has been created and many readymade garment manufacturers are turning towards green industrialization.

A significant feature of the concept of green industrialization is the protection of the environment. It is considered a difficult challenge to run the production process in an environment friendly, electricity, water and gas saving, healthy environment, but this challenge can be met through the implementation of green industrialization concept. Our garment sector has to face tough competition with other countries in the international arena. Our readymade garment sector has to move ahead despite many hurdles, setbacks, conspiracies. Globally now everyone has to pay special attention to environmental protection. Garment buyer countries and international organizations and groups are now imposing environmental and labor-friendly conditions in the garment production process. Their satisfaction can only be achieved by fulfilling the conditions and for this now, compliance has to be given special importance in the garment industry. In the past this issue has been kind of ignored. Pressure from foreign buyers has also played a major role in the growing popularity of the concept of green industrialization.

There is no alternative to sustainable development to survive in the global market. Therefore, to strengthen our position in the global market, we must focus on environmentally friendly production systems. Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) formulation and implementation should be looked at more seriously, along with financing green industrialization. Consumers worldwide are increasingly interested in sustainable and low carbon footprint clothing, and popular fashion brands are also trying to woo consumers with their renewed commitment to eco-friendly clothing. Bangladesh is one of the low carbon emitting countries in the world, yet it is gaining recognition in the world as a renewable energy consuming country. Bangladesh has the largest number of solar home systems. Renewable energy is becoming increasingly popular in Bangladesh's garment industry. BGMEA has already signed ENFCC's initiative Fashion Industry Charter for Climate Action, which aims to reduce greenhouse gas emissions from the apparel sector by 30 percent by 2030.

In the continuation of the modernization and development of the world economy, there is no alternative to environmentally friendly infrastructure and working environment for pioneering and sustainable industrialization in parallel with the Sustainable Development Goals. The temperature of the earth has increased much more than what it was before the industrial age. If this trend continues, the temperature will increase by 1.5 degrees by 2030, according to the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report. In today's world everyone is aware and conscious about climate change. Consumers especially young consumers want to know about the environmental quality of the product such as carbon footprint, water footprint, ecological footprint etc. while purchasing the product. Everyone is now interested in buying and using products produced in environmentally friendly factories. In such a situation, the importance of green industrialization in our garment industry is very high. Not only the needs of the consumer group can be met by using eco-friendly technology, but also the importance of eco-friendly industry is immense in terms of branding and image building. Along with this, a precedent is being created to increase productivity. For this reason, the importance of environment-friendly technology and sustainable green industrialization should be increased not only in the ready-made garment industry, but also in other areas to increase exports.

Rifat Rafique Badhan is a freelancer and a columnist.

CamScanner